রবীন্দ্র মজুমদার কর্তৃক নববঙ্গ ভারতী প্রেস, ২৯/৩, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট হই
মুদ্রিত ও ৩০৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২ হইতে প্রকাশি

পরিচয়

পর্যায় : ২য় সংখ্যা ফেব্রুয়ারী : ১৯৫০ মাঘ : ১৩৫৬

ালাম কুদ্দুস :: সম্পাদক :: সরোজকুমার দত্ত

দাম : আট আনা

রবীন্দ্র মজুমদার কর্তৃক নববঙ্গ ভারতী প্রেস, ২৯/৩, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট হই
মুদ্রিত ও ৩০৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২ হইতে প্রকাশি

পরিচয়

পর্যায় : ২য় সংখ্যা ফেব্রুয়ারী : ১৯৫০ মাঘ : ১৩৫৬

ালাম কুদ্দুস : : সম্পাদক : : সরোজকুমার দত্ত

দাম : আট আনা

পরিচয়

মাঘ ঃ ১৩৫৬

গণরাষ্ট্রগুলিতে সাংস্কৃতিক জয়যাত্রা

গণরাষ্ট্রগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী এবং শ্রমজীবী জনসাধারণ সোশালিজমের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি স্থাপনের পথ ধরে সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে। এই সমস্ত দেশগুলিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মূলগত পরিবর্তন সাংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, সোভিয়েট ইউনিয়নে সোশালিজম গড়ে তোলার অভিজ্ঞতা এই শিক্ষাই দেয় যে, যেখানে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা পেয়েছে সেই সমস্ত দেশে সাংস্কৃতিক বিপ্লব না ঘটিয়ে সোশালিজম গড়ে তোলা যেতে পারে না। পুঁজিবাদ এবং সোশালিজমের মধ্যে যে মূলগত পার্থক্য রয়েছে তা থেকেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বুর্জোয়া সমাজ যে সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে সেই সংস্কৃতির জায়গায় এক নতুন উচ্চতর সংস্কৃতিকে—সোশালিষ্ট সংস্কৃতিকে বসাতে হবে।

শ্রমিকশ্রেণী আর তার অগ্রগামী বাহিনী—কমিউনিষ্ট পার্টিই সোশালিষ্ট সাংস্কৃতির বাহক। গণরাষ্ট্রগুলিতে কমিউনিষ্ট পার্টির সম্মুখে যে সমস্ত প্রধান প্রধান কাজ আজ এসে উপস্থিত হয়েছে তার মধ্যে সব দিক দিয়ে শ্রমজীবী জনসাধারণের সংস্কৃতির স্তরকে উন্নত করা, একটি নতুন সংস্কৃতিকে গড়ে তোলা হ'ল অন্যতম কাজ। আধারের দিক দিয়ে এই সংস্কৃতি হবে সোশালিষ্ট সংস্কৃতি, রূপের দিক দিয়ে এটা হবে জাতীয় সংস্কৃতি, বন্ধনমুক্ত শ্রমের উপর ভিত্তি করে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মহান শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই এই সংস্কৃতি গড়ে উঠবে।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে সোভিয়েট ইউনিয়নে যে রকম ঘটেছিল ঠিক সেই রকম ভাবেই গণরাষ্ট্রগুলিতে কোটি কোটি জনতা তাদের নিজেদের রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য এগিয়ে এসেছে। এই সমস্ত দেশগুলির জনসাধারণের দীর্ঘকালের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম মেহনতী জনতা—জনসাধারণের মধ্যে যারা সংখ্যায় বিপুল, তারা—সচেতনভাবে নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের কাজে লেগেছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রধান কাজ হল ব্যাপকভাবে জনগণকে, সমস্ত শ্রমজীবী জনসাধারণকে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে প্রস্তুত করে তোলা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে তাদের টেনে আনা।

গণরাষ্ট্রগুলির শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে শ্রম সম্বন্ধে এক নতুন মনোভাব দৃঢ়ভাবে জেগে উঠছে। সোশালিষ্ট প্রতিযোগিতার এবং অগ্রগামী বাহিনীর কাজের বিস্তৃতির মধ্যেই এই মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। জনগণের মধ্যে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানোর আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে। এইভাবে শ্রমিকদের শতকরা ৫০ ভাগ এবং আরও অনেক বেশী অংশ আজ পোল্যাণ্ডে, রুমানিয়ায়, চেকোস্লোভাকিয়ায় এবং হাঙ্গেরীতে সোশালিষ্ট প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করছে।

এই সমস্ত দেশে আধুনিক টেকনিক আয়ত্ত করার জন্য জনগণের মধ্যে এক গভীর সাংস্কৃতিক ধারা বিকাশ লাভ করছে। কিন্তু এটা শুধু আরম্ভ মাত্র। পুঁজিবাদের চেয়ে উন্নততর টেকনিকের উপর, পুঁজিবাদী দুনিয়ার চেয়ে শ্রমের উচ্চতর উৎপাদিকা শক্তির উপর ভিত্তি করেই সোশালিজম গড়ে তোলা যেতে পারে। উন্নততর টেকনিক সৃষ্টি করার জন্য পুঁজিবাদের আমলে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির যে অবস্থা আছে তার চেয়ে উচ্চতর অবস্থায় পৌছানোর জন্য এবং পুঁজিবাদকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করার জন্য অতি ব্যাপক ভাবে শ্রমজীবী জনসাধারণের সৃজন শক্তিকে বিকাশিত করা, তাদের রাজনৈতিক, টেকনিকাল এবং সাংস্কৃতিক স্তরকে উন্নত করে তোলা প্রয়োজন।

গণরাষ্ট্রগুলিতে জনসাধারণের মধ্যে নতুন সোশালিষ্ট সম্বন্ধ গড়ে উঠছে। সেরা শ্রমিকদের কাজের সঠিক মূল্য নিরূপণের মধ্য দিয়ে এবং নিজেদের দেশের শ্রমজীবী জনসাধারণের উপকারের জন্য শ্রমের প্রতিযোগিতা এবং পারস্পরিক সমর্থনের মধ্য দিয়ে এই সম্বন্ধ প্রতিফলিত

হচ্ছে। ইতিহাসে এক বিরাট যুগ-পরিবর্তন ঘটছে। এ পরিবর্তন হ'ল সমাজের দিক থেকে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক কর্তব্য হিসাবে শ্রম সম্বন্ধে মনোভাবের পরিবর্তন; এ পরিবর্তন হল সামাজিক সম্বন্ধের পরিবর্তন—শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এই সম্বন্ধগুলি উৎপাদন সরঞ্জামে ব্যক্তিগত মালিকানা দ্বারা, ঐশ্বর্য্য এবং দারিদ্র্যের পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হয়।

গণরাষ্ট্রগুলিতে গ্রামাঞ্চলেও নতুন সোশালিষ্ট সংস্কৃতির কেন্দ্র গড়ে উঠছে। এই কেন্দ্রগুলি হ'ল জনসাধারণের ক্ষমতার, পার্টির, যুব সংগঠনের এবং অন্যান্য সংগঠনের হাতিয়ার বিশেষ। এদের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রের পরিচালনায় সোশালিষ্ট চাষ কেন্দ্রগুলি, চাষাবাদের যন্ত্রপাতির, ট্রাকটরের ডিপো, ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষকদের কো-অপারেটিভ এবং এর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে নতুন নতুন স্কুল, লাইব্রেরী আর ক্লাব।

কো-অপারেটিভের মধ্যে কৃষকদের সংগঠিত শ্রম, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী আর্থিক ব্যবস্থার পরিচালনার ফলে ইতিমধ্যেই আশাপ্রদ প্রাথমিক ফল দেখা যাচ্ছে। যেমন, চেকোস্লোভাকিয়ায় গত বৎসর কৃষকদের ফসল উৎপাদনের কো-অপারেটিভগুলি সাফল্যের সঙ্গে ফসল কাটার সময় শতকরা ২০ থেকে ৫০ ভাগ পর্যন্ত এবং ফসল কাটার সমস্ত খরচ শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ পর্যন্ত কমাতে সক্ষম হয়েছে।

বুলগেরিয়া, রুমানিয়া এবং হাঙ্গেরীতে কো-অপারেটিভগুলি মারফত যে ফসল সংগ্রহ হচ্ছে দেশের মধ্যে তাই হ'ল সেরা ফসল। যে কৃষকেরা গতকাল পর্যন্তও আলাদা আলাদা ভাবে চাষ-আবাদ করত আজ তারাই বৃহৎ আকারের সামাজিক উৎপাদনের পন্থাগুলি সাফল্যের সঙ্গে আয়ত্ত করছে।

কৃষকদের ফসল উৎপাদনের কো-অপারেটিভগুলির ক্রমবর্ধমান সংখ্যা কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যাপারে বিপ্লবী যুগ-পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে তোলে। এ আবার গ্রামাঞ্চলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি এনে দেবে।

গণরাষ্ট্রগুলিতে সোশালিজম গড়ে তোলার কাজে যে প্রশ্নগুলি দেখা দিচ্ছে তা সংস্কৃতির ব্যাপক বিকাশের সঙ্গে সংযুক্ত।

সমস্ত শ্রমজীবী জনসাধারণের নিকট সমসাময়িক জ্ঞানকে সুগম না ক'রে সোশালিজম গড়ে তোলা যেতে পারে না। এই কাজ সুসম্পন্ন ক'রে তোলার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীদের এবং বুদ্ধিজীবীদের বিরাট অংশকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষায় সুশিক্ষিত ক'রে তুলতে হবে—এটাই হ'ল

আজকের দিনের প্রধান প্রশ্ন। এই শিক্ষা সোশালিষ্ট গঠনকার্যের জটিল সমস্যার, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও আন্তর্জাতিক অবস্থা সম্পর্কে সমস্ত প্রশ্নের সমাধানের জন্য তাদের কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে তুলবে।

এই সমস্ত দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল গ্রন্থের বহুল প্রচার এক অভূতপূর্ব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই সমস্ত গ্রন্থের চাহিদা অতি দ্রুতগতিতে বেড়ে যাচ্ছে—প্রচার বিভাগ তার সঙ্গে সমান তালে চলতে পারছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে রাজনৈতিক, অর্থনীতি ও সোশালিজমের শিক্ষার সঙ্গে দ্বন্দ্বমূলক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদও শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে ক্ষার প্রোগ্রাম ও পাঠ্য পুস্তকগুলি পরিবর্তন করা হচ্ছে। এই প্রোগ্রাম ও পাঠ্য পুস্তক থেকে সর্বপ্রকার মেকী-বৈজ্ঞানিক বুর্জোয়া জঞ্জালকে ঝেঁটিয়ে দূর করা হচ্ছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে-ই কারখানায়, খনিতে এবং অফিসে কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে।

এইভাবে, গণরাষ্ট্রগুলিতে বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গীতে এক গভীর বিপ্লবী পরিবর্তন ঘটছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ফিউডাল লর্ডরা, বুর্জোয়ারা, তাদের ভাববাদী আদর্শ প্রচারকেরা, তাদের মতবাদ এবং সংস্কারবাদ যে জরাজীর্ণ ভাবধারা ও চিন্তাধারা, ভাববাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী সমাজ জীবনে প্রোথিত করেছে তাকেই দূর করে দিয়ে এক নতুন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী তার আসন ক'রে নিচ্ছে।

পুরনো সংস্কৃতি যে সাফল্য অর্জন করেছে কমিউনিষ্টরা তাকে অস্বীকার করে না বা একপাশে সরিয়ে রাখে না। সোশালিষ্ট গঠন কার্যে এইগুলিকে ব্যবহার করা যায় কিনা সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তারা এই সাফল্যের দোষ গুণ বিচার ক'রে দেখে।

মানবজাতি তার অগ্রগতির ইতিহাসে যে সমস্ত জ্ঞান অর্জন করেছে এবং যে সমস্ত টেকনিক সৃষ্টি করেছে তা আজ মেহনতী জনতার। যারা আজ নতুন সমাজ গড়ে তুলছে তাদের সম্পত্তিতে পরিণত হচ্ছে।

শুধুমাত্র দুর্দমনীয় ও তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে নতুন সোশালিষ্ট সংস্কৃতি গড়ে তোলা যেতে পারে—এই শ্রেণী সংগ্রামে শ্রমজীবী জন-সাধারণ দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আধুনিক বুর্জোয়া সংস্কৃতির ধ্বংসকারী প্রভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।

বর্তমানকালের সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা শিল্পে ও সংস্কৃতিতে নতুন ঐতিহাসিক সৃষ্টিমূলক কোন কিছু করতে আর সক্ষম নয়। পুরাতন সংস্কৃতিতে যা কিছু অমূল্য রয়েছে তা আয়ত্ত করতে এবং নতুন সোশালিষ্ট সংস্কৃতি গড়ে তুলতে কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণী এবং সোশালিজম-ই সক্ষম।

গণরাষ্ট্রগুলিতে কমিউনিষ্ট পার্টি বুদ্ধিজীবীদের পুরাতন কর্মীদের নতুন ভাবে শিক্ষিত করছে; শ্রমিকশ্রেণীর যুবকদের মধ্য থেকে নতুন এক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে শিক্ষিত ক'রে তুলছে; বিশেষজ্ঞদের শিক্ষা দিচ্ছে; জনসাধারণের সংস্কৃতির সাধারণ স্তরকে উন্নত করার জন্য অধিকতর শক্তি নিয়োগ ক'রে কাজ করছে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে এবং ছাত্র সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ও উচ্চ শিক্ষার জন্য স্কুলের সংখ্যাও ক্রমাগত বেড়ে চলছে।

নিরক্ষরতা এবং অর্ধশিক্ষা ছিল অতীতযুগের অভিশাপঃ গণরাষ্ট্রগুলিতে আজ এই গুলিকে দ্রুতগতিতে দূর করা হচ্ছে। জনসাধারণের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা ক্রমাগতই বাড়ানো হচ্ছে।

সমস্ত গণরাষ্ট্রগুলিতেই থিয়েটার, অরকেষ্ট্রা, সিনেমা, লাইব্রেরী, মিউজিয়াম, এবং কারখানায় কারখানায় ক্লাবের সংখ্যা প্রতিদিনই বেড়ে চলছে। বাগ্মনিকেতনগুলিতে, মিউজিয়ামগুলিতে এবং আর্ট-গ্যালারীগুলিতে আজকাল শ্রমজীবী জনসাধারণের, বিশেষ করে যুবকদের ভিড়-ই বেশি।

দৈনিক পত্রিকা, মাসিক পত্রিকা এবং বইয়ের প্রচার যুদ্ধের পূর্বেকার সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে। শ্রমিকদের মধ্য থেকে অসংখ্য লেখক ও শিল্পী, গান ও থিয়েটারের গ্রুপ এবং অন্যান্য আর্ট-গ্রুপ এগিয়ে আসছে।

আজ যে রকম ভাবে জনসাধারণের আর্ট বিকাশ লাভ করছে এ রকম শক্তিশালীভাবে আর্টের বিকাশ আগে কখনও হয় নি; আজ জনসাধারণের মধ্য থেকে যে রকম ভাবে অধিক সংখ্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তি বের হয়ে আসছে এ রকম আগে কখনও দেখা যায় নি।

ফর্মালিজমের বিরুদ্ধে, ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সংগ্রামে শিল্পে ও সাহিত্যে সোশালিষ্ট রিয়ালিজমের প্রধান প্রধান রচনাবলীও তৈরী হচ্ছে।

আজকের দিনের প্রধান প্রশ্ন। … হচ্ছে ; নিজেদের
সমস্যার, দেশের আভ্যন্তরীণ অ… পৌঁছে দেবার
প্রশ্নের সমাধানের জন্য তাদের … জন-

এই সমস্ত দেশে মার্কসব…
অভূতপূর্ব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ি…

এই সমস্ত গ্রন্থের চাহি…
তার সঙ্গে সমান তালে … মানুষ জন্ম

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে … মানুষ প্রতি-
সঙ্গে দ্বন্দ্বমূলক এবং … অবজ্ঞার চোখে
…ক্ষার প্রোগ্রাম … প্রতি একান্ত ভাবে
ও পাঠ্য পুস্তক …
করা হচ্ছে। … বিশ্ব-প্রগতির অগ্রগামী
খনিতে এবং … এগিয়ে চলেছে, সোভিয়েট

এইভা… তৃভূমিও সেই সমস্ত দেশের মধ্যেই
ঘটছে। … সোভিয়েট ইউনিয়নে সৃষ্টি হয়েছে এক
ভাববাদী … যে মানবজাতি ঐতিহাসিক অনিবার্যতা
ভাবধা… অগ্রসর হচ্ছে তাদেরই আগামী দিনের সংস্কৃতির
তাদের… সোশালিষ্ট সংস্কৃতি।

অ… শ্রমজীবী জনসাধারণ তাদের মহান ঐতিহাসিক সৃষ্টি
… লিষ্ট সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজে—সোশালিষ্ট সোভিয়েট
… দ্বারাই অনুপ্রাণিত।

[কমিনফর্মের মুখপত্রের ১৩ই জানুয়ারীর সম্পাদকীয়।]

জোয়ার

পৌষের এক সকাল। চারদিকে তখনও ভাল করে ফর্সা হয় নি। আলো আর আঁধারের হাতাহাতি লড়াই চলেছে পূব থেকে পশ্চিমে। আলোর আক্রমণে অন্ধকার ছুটে পালাচ্ছে ভয়ে। হাওড়ার ব্রীজটা ঢাকা পড়েছে কুয়াশায় আর গঙ্গার বুকেও সাদা থমথমে কুয়াশা জমাট বেঁধে আছে। আবছা আবছা জাহাজ নৌকাগুলো কোন রকমে বোঝা যায় ভাটার টানে নদীর জল নেমে গেছে অনেক তলায়—স্রোতের কোন লক্ষণ তাতে নেই। একটা নিস্তব্ধ থম্‌থমে ভাব যেন পৃথিবীকে ঘিরেছে। গরীবের চিন্তার মত শীতের নিষ্ঠুর দাঁত সমস্ত দুনিয়াটাকে কামড়াচ্ছে। পৃথিবী ভাবছে সূর্যের তীক্ষ্ণ বল্লমগুলো কখন ছিন্ন ভিন্ন করবে অন্ধকার আর কুয়াসাকে?—পৃথিবীর জীবনের দুশমনরা কখন পরাজিত হবে? সারা রাতের যন্ত্রণা নিংড়ে তৈরী হয়েছে পৃথিবীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা—এই ভোরে আবছা আলোয় যা কিছু দেখা যাচ্ছে সবই যেন এক মহা-ভাবনায় থম থম করছে।

জেঠিতে একখানা মাত্র জাহাজ বাঁধা রয়েছে। ব্রীজের উপর দিয়ে দু একজন করে মজুরেরা চলেছে কাজে। জেঠির মজুররা বেশীর ভাগই থাকে হাওড়ায়। টিকিয়া পাড়া, পিলখানা, কালীবাবু বাজারে, সবজায়গাতেই দশ পনর জন মজুর থাকে। ক'লকাতার শহরে ঘর ভাড়া করে থাকবার মত অবস্থা কারুরই নয়। অনেক দূর থেকে আসতে হয় বলে ওরা খুব সকালেই ওঠে। কেউ বা অন্ধকার থাকতে উঠে খানা তৈরী করে কেউ বা বাসি রুটি আর চা খেয়েই বেরিয়ে পড়ে।

সাত নম্বর অর্থাৎ দশ নম্বর জেঠির বার নম্বর কুলীগ্যাং-এর সাত নম্বর কুলী কাজে চলেছে একলা। অবশ্য তার একটা নাম আছে কিন্তু জেঠিতে নামের প্রয়োজন খুব কমই—পরস্পরের ডাকাডাকিটা নম্বর ধরেই চলে। বন্দরের কর্তারা ওদের বাপ মায়ের দেওয়া মানুষের নাম মুছে দিয়েছে। যাক তবু নামটা জেনে রাখা ভাল। ওর নাম মঙ্গরু চামার। জেঠিতে জাহাজ কম দেখে মনটা ছ্যাঁত করে ওঠে। শনিবার দিন একজন মহাজন বলছিল ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা নাকি খুব খারাপ।—তার কথা শুনে সুলতান

দেশের সর্বোৎকৃষ্ট গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে ; নিজেদের দেশের শিল্প ও সংস্কৃতির সাফল্যকে জনসাধারণের নিকট পৌছে দেবার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। এইভাবে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক ক্ষমতা জনসাধারণকে আরও গভীরভাবে স্বদেশকে ভালবাসতে শিখাচ্ছে—স্বদেশের প্রতি এই ভালবাসা আজ সত্যসত্যই বিকাশ লাভ কর্‌বার পথ পেয়েছে; অতীতে দেশের সেরা দেশপ্রেমিকরা এই পথের জন্যই লড়াই করেছেন।

গণরাষ্ট্রগুলিতে সোশালিজমের সংগ্রামে আজ এক নতুন মানুষ জন্ম লাভ করছে—এ মানুষের রয়েছে নতুন নৈতিক জ্ঞান, এ মানুষ প্রতিক্রিয়াকে এবং সাম্রাজ্যবাদীদেরকে ঘৃণা করে, পরগাছাদের অবজ্ঞার চোখে দেখে ; এবং এ মানুষ মানবজাতির মুক্তির আদর্শের প্রতি একান্ত ভাবে অনুগত।

তার মাতৃভূমির সে একজন দেশপ্রেমিক। বিশ্ব-প্রগতির অগ্রগামী বাহিনী হিসাবে যে সমস্ত দেশ আজ এগিয়ে চলেছে, সোভিয়েট ইউনিয়নকে অনুসরণ ক'রে তার মাতৃভূমিও সেই সমস্ত দেশের মধ্যেই নিজের আসন ক'রে নিয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন সোশালিষ্ট সংস্কৃতি। যে মানবজাতি ঐতিহাসিক অনিবার্যতা নিয়ে সোশালিজমের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তাদেরই আগামী দিনের সংস্কৃতির একটি সংস্করণ হল এই সোশালিষ্ট সংস্কৃতি।

গণরাষ্ট্রগুলির শ্রমজীবী জনসাধারণ তাদের মহান ঐতিহাসিক সৃষ্টি কার্যে—সোশালিষ্ট সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজে—সোশালিষ্ট সোভিয়েট ইউনিয়নের দ্বারাই অনুপ্রাণিত।

[কমিনফর্মের মুখপত্রের ১৩ই জানুয়ারীর সম্পাদকীয়।]

জোয়ার

পৌষের এক সকাল। চারদিকে তখনও ভাল করে ফর্সা হয় নি। আলো আর আঁধারের হাতাহাতি লড়াই চলেছে পূব থেকে পশ্চিমে। আলোর আক্রমণে অন্ধকার ছুটে পালাচ্ছে ভয়ে। হাওড়ার ব্রীজটা ঢাকা পড়েছে কুয়াশায় আর গঙ্গার বুকেও সাদা থমথমে কুয়াশা জমাট বেঁধে আছে। আবছা আবছা জাহাজ নৌকাগুলো কোন রকমে বোঝা যায় ভাটার টানে নদীর জল নেমে গেছে অনেক তলায়—স্রোতের কোন লক্ষণ তাতে নেই। একটা নিস্তব্ধ থম্‌থমে ভাব যেন পৃথিবীকে ঘিরেছে। গরীবের চিন্তার মত শীতের নিষ্ঠুর দাঁত সমস্ত দুনিয়াটাকে কামড়াচ্ছে। পৃথিবী ভাবছে সূর্যের তীক্ষ্ণ বল্লমগুলো কখন ছিন্ন ভিন্ন করবে অন্ধকার আর কুয়াসাকে ?—পৃথিবীর জীবনের দুশমনরা কখন পরাজিত হবে ? সারা রাতের যন্ত্রণা নিংড়ে তৈরী হয়েছে পৃথিবীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা—এই ভোরে আবছা আলোয় যা কিছু দেখা যাচ্ছে সবই যেন এক মহাভাবনায় থম থম করছে।

জেঠিতে একখানা মাত্র জাহাজ বাঁধা রয়েছে। ব্রীজের উপর দিয়ে দু একজন করে মজুরেরা চলেছে কাজে। জেঠির মজুররা বেশীর ভাগই থাকে হাওড়ায়। টিকিয়া পাড়া, পিলখানা, কালীবাবু বাজারে, সবজায়গাতেই দশ পনর জন মজুর থাকে। ক'লকাতার শহরে ঘর ভাড়া করে থাকবার মত অবস্থা কারুরই নয়। অনেক দূর থেকে আসতে হয় বলে ওরা খুব সকালেই ওঠে। কেউ বা অন্ধকার থাকতে উঠে খানা তৈরী করে কেউ বা বাসি রুটি আর চা খেয়েই বেরিয়ে পড়ে।

সাত নম্বর অর্থাৎ দশ নম্বর জেঠির বার নম্বর কুলীগ্যাং-এর সাত নম্বর কুলী কাজে চলেছে একলা। অবশ্য তার একটা নাম আছে কিন্তু জেঠিতে নামের প্রয়োজন খুব কমই—পরস্পরের ডাকাডাকিটা নম্বর ধরেই চলে। বন্দরের কর্তারা ওদের বাপ মায়ের দেওয়া মানুষের নাম মুছে দিয়েছে। যাক তবু নামটা জেনে রাখা ভাল। ওর নাম মঙ্গরু চামার। জেঠিতে জাহাজ কম দেখে মনটা ছ্যাঁত করে ওঠে। শনিবার দিন একজন মহাজন বলছিল ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা নাকি খুব খারাপ।—তার কথা শুনে সুলতান

চাচা বলেছিল যে, গেলবার যুদ্ধের পরে চৌত্রিশ সালে নাকি এমনি অবস্থা হ'য়েছিল আর সেইজন্য সেবার বন্দর থেকে চার পাঁচ হাজার লোকের চাকরি গিয়েছিল। মঙ্গরুর চাকরি এখনও পাকা হয়নি—"কি জানি অবস্থা যদি সেবারের মত দাঁড়ায়"। কথাটা ভাবতে ভাবতে চলেছিল মঙ্গরু। গঙ্গার বুক থেকে একটা ঠাণ্ডা দমকা হাওয়া উঠে এসে হাড়ের মধ্যে পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। লড়াইয়ের সময় একটা খাকী সার্ট পেয়েছিল ও সেইটেই আজ পর্যন্ত গায়ে দিচ্ছে কিন্তু সেটাতে শীত কম হওয়া দূরে থাক—ভিজে যেন সপ সপ করছে। পাঁচমাস আগেও কাজের চাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'য়ে উঠেছিল কিন্তু এখন টুকটাক কাজ বেলা এগারোটার মধ্যে শেষ হ'য়ে যায়—বাকি বেলাটা গল্প সল্প করেই কাটে।

ডান পায়ের থ্যাতলানো আঙ্গুলটার মধ্যে টন্‌টন করে উঠলো। সেদিন একটা লোহার ডাণ্ডা পড়ে গিয়েছিল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হাতে পায়ে কোন সাড়া ছিল না এতক্ষণ; গুদোমে গিয়ে হাতগাড়ী না ঠেললে শীত যাবে না। একটু তাড়াতাড়ি পা চালায় মঙ্গরু। শীতের জন্যে রাতে ভাল ঘুম হয় নি।

সামনে চেনা গলা পাওয়া গেল। কান পেতে শুনলো মঙ্গরু। "দশ নম্বরের গলার মত না?" সন্দেহটা মেটানোর জন্যে ও হাঁক ছাড়লো "হেই দশ নম্বর………।" একটু দূর থেকেই জবাব এলো—ও ও ও।

সামনের দলটা ফিরে দাঁড়ালো। মঙ্গরু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ওদের সাথ ধরে।

দশ নম্বর (মঙ্গলরাম) জিজ্ঞাসা করল "তোমার এত দেরী যে—গাড়ি তো বোধ হয় এতক্ষণ কে-জি-ডি (কিং জর্জ ডকে) পৌঁছে গেল —ট্রামে যাবে নাকি?"

"আরে না না কাল ছুটির সময় সোয়ার্টার সাহেব (সুপার কারগো) বুকিং কেটে দিলো যে।"

খেঁকিয়ে উঠে রামলক্ষ্মণ বললো, "শালা শুয়োরের বাচ্চারা আমাদের দিয়ে আজকাল ঘোড় দৌড় করাচ্ছে—আজ খিদিরপুর ডক—কাল কে-জি-ডি (কিং জর্জ ডক), পরশু দিন ইমপোর্ট।………আমি বুঝতে পারি না যে সব মজুর গেল কোথায়? যুদ্ধের সময় এত জাহাজ খালাস করেছি—কৈ এরকম টানাটানি হয় নি তো?"

মঙ্গরু বললো, "বা লোক কমেনি কি বলছো? লড়াইয়ের সময় এক একটা গ্যাং-এ ছিল তিরিশ জন ক'রে আর এখন সেখানে মাত্র বারো তেরো জন।"

"হ্যাঁ তা অবশ্য ঠিক; কিন্তু এ সব গেল কোথায়?" রামলক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করল।

কেন? এই ধর আমাদের গ্যাং-এর সুখদেও মরে গেল—লড়াইয়ের সময় সরাফদেও বোমার ভয়ে পালিয়ে গেল, শঙ্কর দেশে গিয়ে দেরী করে ফিরলো বলে আর চাকরি পেল না। এ সব খালি জায়গায় কোম্পানি কি লোক ভর্তি করেছে? না।—একজনও নেয় নি। কারণ কোম্পানী মাস মাইনে করা গ্যাং দিয়ে কাজ করাবে না। এখন সব নগদাওয়ালা গ্যাং থাকবে—কাজ হ'লে মাইনে না হ'লে বসে থাকবে। আরে আর একদিন রামধনী ভাইয়ের কথা শুনলে না? ও হো না তোমরা তো ছিলে না সেদিন।"

নামটা শুনে সবাই যেন চমকে উঠলো। হৃদপিণ্ডের মধ্যে এক ঝলক রক্ত যেন হঠাৎ উঠে এলো। গলা খাটো করে মঙ্গলরাম জিজ্ঞাসা করল, "রামধনী ভাই কোলকাতায় আছে?. সে তোমার ওখানে গিয়েছিল নাকি?"

"আছে—আছে। কিন্তু বসে নেই—তার কাজ সে ঠিক ক'রে যাচ্ছে—হাঁ মার দুধ খেয়েছিল বটে রামধনী ভাই—শালা আমাদের মত নিজের পেট নিয়ে মরে নি। সবুর কর দু'চার দিন, তোমাদের বস্তিতে যাবে হয়তো কয়েকদিনের মধ্যেই।"

রামলক্ষ্মণ বললো, "আচ্ছা ওসব কথা রাস্তায় বলা ঠিক না—হয়তো তার কোন বিপদ হোতে পারে………।"

ষ্ট্র্যাণ্ড রোড হ্যারিসন রোডের মোড়ে তখনও বেশী লোক নেই। দু'পাশে বিরাট বাড়ীগুলোর মাঝখানে ফাঁকা সোজা কুয়াশা ঢাকা বিরাট মানুষের মুখের মত হাঁ কোরে রয়েছে। এইখানে সারাদিন ধরে গাড়ী গাড়ী মাল বোঝাই হ'য়ে আসে জেঠি থেকে কিন্তু তার একটা মালও মেলে না বাজারে। এখানে শুধু টাকা টাকা আর টাকা—গরীবের পেট কাটা ষড়যন্ত্র চলে, মানুষ ঠকানোর নানারকম যন্ত্র তৈরী হয়। চোরা বাজারের ফিকির খোঁজে। একটা বড় দোকানের সামনে ভুঁড়িওয়ালা

একটা লোক ছোলা, ডাল ছড়িয়ে দিচ্ছে রাস্তায়—এক ঝাঁক পায়রা তার উপর পড়ে ট্রেন ফেল হ'য়ে যাবার মত তাড়াতাড়ি গিলে যাচ্ছে।

মঙ্গলরাম বলল৷ "ওরা এত টাকা কামালে কি হ'বে খুব দান ধ্যান করে দোকান খুলেই আগে কবুতর যাড়কে খাওয়ায়—হপ্তায় একদিন কাঙ্গালী বিদায় করে।

মঙ্গরু ওর কথায় চটে গিয়ে বলে, "তোমরা তো ঐ দেখবে—ওর দোকানে যারা কাজ করে তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখতো কত মাইনে পায়?—তাতে তার পেট ভরে কি না? মানুষ মেরে যারা কবুতর খাইয়ে পুণ্য করে তারা হচ্ছে পাকা শয়তান।"

কথাটা মঙ্গলরামের জানা—তাই সে আর প্রতিবাদ করে না।

মঙ্গরু আবার বলে, "ওদেরই লোক তো আমাদের বন্দরের কমিশনার। সেই জন্যেই তো আমাদের মাইনে বাড়ায় না—বাড়ালে যে ওদের মুনাফা কম পড়ে।"

জেঠির হাজিরীর ঘণ্টা বাজছে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ওরা গুদামে এসে হাজির হোল। ভেরার খোঁয়াড়ের মত কাতারে কাতারে মজুর নম্বর মিলিয়ে নিজের গ্যাং-এ বসেছে। সোয়ার্টার সাহেব একটা লম্বা খাতায় নম্বর টুকে নিচ্ছেন। কাউকে জাহাজের মাল খালাসে, কাউকে গাড়ী বোঝাইতে, কোন গ্যাংকে আবার পাঠিয়ে দিচ্ছেন অন্য গুদোমে। যাদের অন্য গুদোমে পাঠানো হোল তাদের মুখে বিরক্তির লক্ষণ ফুটে উঠলো। সাহেবের খোসামুদেরা হালকা কাজ পেলে।

হাজিরী শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে জেঠির ঘুম যেন ভেঙে গেল। ট্রলি, ক্রেন আর হাতগাড়ী চালিয়ে পরীক্ষা করা, তেল দেওয়া শুরু হ'ল; পেয়ারের হাতগাড়ীটা বেহাত হ'য়ে যাওয়ায় ভগলু আর আলমের মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে ও পাশটাতে।

অনেকক্ষণ ধরেই ক্রেনে মাল ঝুলিয়ে দিয়েছে কিন্তু কেউ মাল নেবার জন্যে তাড়া করে না। জাহাজের ডেক ফোরম্যান চেঁচিয়ে উঠল, "ও সারেঙ্গ, বলি মালটা আড়িয়া (নামানো) নেবে কি না?"

ভরত সারেঙ্গ চেঁচিয়ে বললো "এ বারো নম্বর গ্যাং......তোমরা কি সারাদিন গাড়ীতে তেলই দেবে, না মালটাল আড়িয়া নেবে।"

বারো নম্বর গ্যাং ডেক ফোরম্যানের ওপর খেঁকিয়ে উঠলো, "এ শালার

রাত্তিরে ঘুম হয় না—সকাল হোতে না হোতেই আড়িয়া নাও—আড়িয়া নাও কোরে চেঁচাতে শুরু করেছে......চুপচাপ থাক.........গাড়ীতে তেল দেওয়া হোলে তারপর মাল আড়িয়া নেওয়া হবে।"

গজ গজ ক'রতে ক'রতে ডেক ফোরম্যান ওপাশের হ্যাচের দিকে (খোল) এগিয়ে যায়. "শালাদের সঙ্গে কথা বলাই দায় হয়ে উঠেছে।"

জাহাজের একজন কেরানি বললো, "তা জানেন যদি তো ওদের বলতে যান কেন—জানেন ওরা আজকাল কাউকে পরওয়া করেনা—গবর্নমেণ্ট পর্যন্ত খানিকটা তোয়াজ ক'রে চলে—সে আগেকার দিনের কথা ভুলে যান। এখন ইউনিয়ন হ'য়েছে..... বুঝেছেন?"

রাগে ফোরম্যান লাল হ'য়ে গেছে। পকেট থেকে বিড়ি বের ক'রে ধরিয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়।

"হুঁ: ঐ ইউনিয়নই ছোট লোকগুলোকে মাথায় তুলে আস্কারা দিয়েছে... এই তো ধরুন না আগে দেখেছি টালিবাবুদের টেবিলে কোন কুলী বসতে সাহস ক'রতনা; কিন্তু এখন দেখুন কি রকম লাট সাহেবের মত বসে থাকে.........আর কাজ তো মোটেই করে না......খালি কি ক'রে ফাঁকি দেবে—এই চিন্তা। আধঘণ্টা কাজ......তা শুরু ক'রতেই আধঘণ্টা গেল তার—টিফিনের পনের মিনিট আগে বন্ধ—টিফিনের পর পনের মিনিট বাদে কাজ শুরু হবে তারপর ছুটির আধঘণ্টা আগে আবার বন্ধ ক'রে দেবে—এই তো দেড় ঘণ্টা বরবাদ হয়ে গেল—এছাড়া জল খেতে গেছে—ক্রেনড্রাইভারের পায়খানা পেয়েছে—গাড়ীতে তেল দেওয়া এসব তো আছেই.........ইংরেজের যুগে যা ছিল তার চেয়েও ফাঁকি এখন বেড়েছে।" কথাটা বলে ডেক ফোরম্যান হাতের বিড়িতে প্রচণ্ড জোরে টান দেয়। কাসির দমকে সমস্ত দেহটা কেঁপে ওঠে—গলার শিরাগুলো ফুটে ওঠে।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে অর্জুন আর ভরত সারেঙ্গ কথা বলছিল। ওরাও এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা ক'রছিল—"দেখো একটা হাতগাড়ীতে দুটো বস্তা চাপিয়ে নিয়ে চলেছে অথচ আগে একগাড়ীতে আটটার কম বস্তা দিলে সোয়ার্টার লাঠি পেটা ক'রত কিন্তু এখন কিছু বললে উল্টে তোমাকেই বেইজ্জতি ক'রবে—খুবই আপসোসের কথা—এমন দিন কাল পড়েছে যে কি বলবো—মানী লোকের ইজ্জত রাখাই দায়। অর্জুন সারেঙ্গ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো।

পুরোদমে জেঠির কাজ শুরু হয়ে গেছে—ইঞ্জিনগুলো বড় বড় মালগাড়ী টেনে নিয়ে আসছে—শত শত হাত গাড়ী, ট্রলি চলার গড়গড় শব্দ সঁর সঁরর সঁরাৎ শব্দে ক্রেনগুলো টেনে তুলছে মাল—পুলিস লঞ্চের গোঙ্গানি আওয়াজ কাঁপিয়ে দিচ্ছে বুকের ভেতরটা শুদ্ধ—শ্রম আর চক্রজগতের সংঘর্ষের প্রচণ্ড গর্জনে লুপ্ত হ'য়ে গেছে দুনিয়ার সব কিছু। মাতালের নেশার ঝোঁকের মত—খাটুনিরও একটা ঝোঁক আছে। কিছুক্ষণ কাজ করার পর যন্ত্রের মত আপনা আপনি চলে হাতপা—তাতে থাকেনা কোন সাড়া।

সোডা উড়ে নাকের মধ্যে ঢুকছে—অনবরত :জল পরছে সবার নাক দিয়ে। এই শীতের মধ্যে ঘাম বেরিয়ে যাচ্ছে গা দিয়ে। গোলামির শৃঙ্খল বাজছে.........ঝন ঝন। প্রকাণ্ড ইস্পাত খোলের মধ্যে যেন গুমরে মরছে একটা প্রচণ্ড শক্তি সেটা কবে ভীষণ জোরে ফেটে যাবে আর খান খান হ'য়ে গুড়িয়ে যাবে গোলামীর দুনিয়া।

আজকাল জেঠির মজুররা যেন কিভাবে। বেশী কথাবার্তা কয় না—অবসর পেলে ঘুমোয়, নয়তো হাটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে থাকে—কথায় কথায় রেগে যায়—সে রাগের জের চলে জেঠির বাইরের রাস্তা পর্যন্ত—তেরিয়া হ'য়ে মারতে ওঠে।

এই এক্ষুণি ঝগড়া লেগেছিল বংশী আর রাজকিশোরের মধ্যে। জাত তুলে খোটা কত সময়ই দেয় কিন্তু তা নিয়ে এরকম মারামারি লাগে না। জাতের জন্য বংশী যে খুব বেশী পরওয়া করে তা নয়—আসলে ওটা উপলক্ষ ঐ উপলক্ষে ভেতরের রাগটা বেরুল। মঙ্গরু না ধরে ফেললে রক্তারক্তি হ'য়ে যেত। ওদের থামিয়ে দিয়ে মঙ্গরু গাল দেয় "নিজেদের মধ্যে তোমরা ঝগড়াঝাটি কর কেন ?"

পরিয়াগ মনমরা হয়ে এসে দাঁড়ালো। মঙ্গরু জিজ্ঞাসা করে "কি রে শরীর খারাপ হোল নাকি ?"

—"আরে না ভাই—গাওনার (দ্বিতীয় বিবাহ) তারিখ ঠিক হয়ে গেছে, ঘর থেকে চিঠি এসেছে কিন্তু লেবর অফিসার ছুটি দিলে না—বললে দুমাস বাদে ছুটি পাবে।" বললো পরিয়াগ। ওর চোখে মুখে অসহায়ের ভাব।

মঙ্গরু বললো, "তুই একটা দরখাস্ত দে যে আমার গাওনার তারিখ বদল করা চলবে না—আমি বাড়ী চললাম, তোমরা ছুটি দাও ভাল, নয়তো আমার

পাওনা চুকিয়ে দাও চাকরি আর কোরব না। তারপর কাজকর্ম শেষ ক'রে ফিরে আয় তখন দেখা যাবে।"

পরিয়াগ চলে যাবার পর কথাটা নিয়ে বারো নম্বর গ্যাংএর মজুররা আলোচনা করে। ঘটনাটা এই প্রথম নয় আরও কয়েকবার কয়েকজনকে এই রকম দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছে। গোলামের কাছে বিয়ে, মা মরা, বাপের অসুখ কোনটারই কোন মূল্য নেই।

রামলক্ষ্মণ বললো "আরে কি বলবো দিনের পর দিন জুলুম বেড়ে চলেছে, —তোমরা শুনেছ কিনা জানিনা, ঐ যে তিন নম্বর গ্যাং-এর ভিখু আছে ওর বউটা আর একদিন গাঁয়ের কয়েকটা খারাপ লোকের সঙ্গে পালিয়েছে—দু'বছর ছুটি পায়নি ভিখু—ছুটিতো পাওনা নেই—কাজেই ছুটি নিলেই মাইনে কাটা যাবে—আবার কুড়ি দিনের বেশী ছুটিও দেয় না—ঘর যেতে আসতেই তো সাত দিন। তাহ'লে বল একটা সেয়ানা বউ কি ক'রে থাকে ? তা পালালো তো পালালো ওর টাকা পয়সা, গহনা একবারে সব নিয়ে গেছে —ছুটি চেয়েছিল তা সাহেব বলেছে যে পালানো বউ দিয়ে আর কি হবে। আর একটা বিয়ে কর—এখন ছুটি পাবে না।"

মঙ্গরু ক্ষেপে যায় ওর কথায়, "হ্যাঁ হ্যাঁ ও খবর আমি শুনেছি কিন্তু ওশালারা তো বলবেই ও কথা ; কিন্তু ভিখুরই বা আক্কেল কি বল—বউ চলে গেল তার জন্যে আপসোস। হায়রে দুনিয়া। টাকা টাকা ক'রে সব কিছু বরবাদ কোরতে বসেছে—সাহেবের মুখে একটা চড় মারতে পারেনি। হারে শালা গোলামের জাত।"

মঙ্গরুর কথাটা সবারই মনে লেগেছে। কথা আর এগোয় না। কাজ চলতে চলতে মাঝে মাঝে অবসর মেলে। নিজেদের সুখ দুঃখের কথায় কথায় এই মুহূর্তগুলো ভরিয়ে তোলে ওরা আর মাঝে মাঝে গুম হ'য়ে ভাবে—

হঠাৎ জেঠির ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠলো মজুররা। ওরা মুখ ফিরিয়ে দেখলো—একটা ছোট মেয়ের হাতধরে একটা মেয়ে মানুষ এদিকে আসছে। মজুররা যেন একটু দম ফেলে বাঁচল। রামলক্ষ্মণ বললো, "দেখতো হরবংশ এয়েছে কিনা।"

'হঁা, হরবংশ চোদ্দ দিনের ছুটি নিয়ে ভেগেছে"—জবাব দেয় মঙ্গলরাম। রামলক্ষ্মণ বলে, "তা এও তো বাপু অন্যায়, ওকে যখন রেখেছিস তখন একটা খরচা তো দিতে হবে। বউ থাক্‌লে দিতে হোত কি না বল।"

"তা তো দিতে হ'তো ; কিন্তু ও মাগীরও বদমাইসী আছে। ওর সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে বাক্সে চাবি দিয়ে রেখেছে—মায় অফিস থেকে দেওয়া জামাটা শুদ্ধু। দেখোনা হরবংশ ছেঁড়া গেঞ্জী গায় দিয়ে অফিসে আসে রোজ। মাগীটা ক'দিন ধরে লেবর অফিসারের কাছে ঘোরাঘুরি ক'রছে যদি সাহেব দয়া করে কিছু দেয়। ওর মাইনে থেকে কেটে।"—মঙ্গলরাম বলছিল।

মঙ্গরু জিজ্ঞাসা করল রামলক্ষ্মণকে, "এ রামলক্ষ্মণ ভাই, ও মাগীটা সেই ভগবতী কাহারের বউ না ?"

"হাঁ হাঁ সেই যে বোমা পড়ার সময় ডকে মারা গেল ভগবতী তারপর ও দিন কতক থাকলো জগমোহনের সঙ্গে—জগমোহনেরও হোল দুর্দশার একশেষ—শেষকালটায় ছেড়ে দিলো ওকে—এখন জুটেছে হরবংশের সঙ্গে।"

মঙ্গরু মজুরদের মধ্যে কারুর কারুর এই অভ্যাসের তীব্র সমালোচনা করে। কোম্পানি ছুটি দেয় না, বাড়ী যেতে পারে না সেই জন্যে আর একটা মেয়ে মানুষ রাখতে হবে কেন ? কোম্পানিকে ছুটি দিতে বাধ্য করা, তা না করে পিছনের দরজা দিয়ে সমস্ত অভাব মেটানোর এ অভ্যাস খুব খারাপ—রামধনী ভাই ফেরারী হওয়ার পর আমাদের এই সব জিনিস নিয়ে আর বলবার কেউ নেই।

রানধনীর কথাটা উঠতে সকলের দুঃখটা বেড়ে উঠলো আবার। সেই বেপরওয়া লোকটা না থাকার জন্যেই তো আজ এতো জুলুম বেড়েছে কিন্তু তার জায়গা নিতে পারে কে ? সাহেবদের মুখের ওপর তেরিয়া হ'য়ে কথা বলতে পারে কে ?

ওরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে খোঁজে সেই লোক—কে পারে জায়গা নিতে ?

রামলক্ষ্মণ বললো "রামধনী ভাই থাকলে পরিয়াগের গাওনার ছুটি এক মিনিটে আদায় হ'য়ে যেত।"

প্রত্যেকটা জুলুম আর অভাবের সাথে ওদের মনে ভেসে উঠে রামধনীর ছবি। রামধনীও মজুর, সে ওদেরই একজন তবু ওদের থেকে আলাদাও। সমস্ত জেঠির মজুর ভাবে ঐ রকম একটা লোকের অভাব। পোর্টের মজুরদের ইজ্জত বাড়িয়েছে রামধনী—তিন মাস ধর্মঘটের রামধনী আজ কোথায় ? মঙ্গরু আশ্চর্য হয়ে ভাবে সে দিনের কথা।

বাংলা সরকার যখন নিরাপত্তা আইন পাস করে তখন এই বন্দর থেকে

কুড়ি পঁয়ত্রিশ জন বাবু আর মজুরকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। রামধনী তখন বসেছিল ঠেলা গাড়ীর উপর। হঠাৎ এসে সোয়ার্টার সাহেবকে বললো যে আমার বউয়ের বড্ড অসুখ আমি বাড়ী চললাম। সেই যে রামধনী গেল আর ফিরলো না।

পরে শোনা গেছে যে রামধনীর নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা আছে—রামধনী ফেরারী। কিছুদিন চুপ চাপ থাকবার পর রামধনী গভীর রাতে মজুরদের বস্তিতে বস্তিতে ঘুরতে শুরু করেছে দু একজন করে মজুর খবর পায় তার গতিবিধির। আলোচনাটা বেড়ে ওঠে, অনেকেই দেখা করতে চায় কিন্তু কেউ সঠিক জানে না কোথায় থাকে সে।

হঠাৎ নজরে পড়লো দেয়ালের গায়ে কারা ইস্তাহার লাগিয়ে দিয়ে গেছে রামধনীর উপর থেকে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা তুলে নাও। জেঠির মজুর আন্দোলন ছেড়োনা, সমস্ত জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়াও।

কথাগুলো ভাবায় মজুরদের। গায়ের মধ্যে নিশপিষ করে কিন্তু কি করে করা যায়। আসল কথাটা অবশ্য তা নয়। বুঝতে পারে সবাই কিন্তু জমানা খারাপ। এক পা বাড়ালেই গ্রেপ্তার, জেল, খারিজ—ছেলে পিলে বউ দাঁড়াবে কোথায় ? আগে আগে সবাই আন্দোলন করেছে কিন্তু তাতে এ ঝুঁকি ছিল না—আর তা ছাড়া পুরোপুরি জোরও পাওয়া যাচ্ছে না মনে। প্রত্যেক দিনকার জীবনের নানা কাজের মধ্যে ডুবে যায় ওরা। অন্য কারখানার মজুররা হরতাল করে, রাস্তা দিয়ে যায় একটা মিছিল, কোথাও গুলি চলে। আবার শুরু হয় ওদের মধ্যে আলোচনা কিন্তু রামধনীর মত লোক না হ'লে আর এগুনো যাচ্ছে না এটা বোঝে সবাই। মজুরদের একতা ভেঙ্গে গেছে। চারিদিকে মালিকের চর ঘুরে ঘুরে হতাশা ছাড়াচ্ছে। প্রত্যেক গুদোমে পুলিসের চর নজর রাখছে।

শহরের অবস্থাটা ভয়ানক থমথমে। জেলখানায় নাকি অনশন ধর্মঘট করেছে রাজবন্দীরা, তার মধ্যে বন্দরের ইউনিয়ন নেতারাও আছে। একটা লোক এ বিষয়ে মজুরদের মধ্যে ইস্তাহার বিলি করে দিয়ে গেল। মাঝে মাঝেই অনশন ধর্মঘট আর মারপিট হয় জেলে। শহরের রাস্তায় পুলিসের সঙ্গে হয় খণ্ডযুদ্ধ। মজুররা ভেবে পায় না যে এসব অশান্তি কেন হয়। অনেকে সমর্থন করে কিন্তু মুখ খুলতে পারে না—ভাইও শত্রু হ'তে পারে এ জমানায়। তবু মঙ্গরু বোঝায় গ্যাংএর লোকদের।

টিফিনের ঘণ্টা বেজে গেছে। এক এক জায়গায় মজুররা দলে দলে বসে আছে। কারুর হাতে একপো ছাতু, কেউ বা এনেছে বাড়ী থেকে ছুখানা রুটি আর একটু গুড়। আবার অনেকে শুধু চার পয়সার চানা মুড়ি চিবোচ্ছে।

মঙ্গলরাম মঙ্গরুকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন ক'রলো "আচ্ছা নেহেরুজীকে ওরা গালাগাল দিচ্ছে কেন? তিনি তো খারাপ কাজ করেন নি? আমাদের সম্বন্ধে যদি তার কাছে সত্যি খবর যেত তা'হলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের মাইনে বাড়াতেন। কিন্তু কমিশনাররা খবর চেপে দিচ্ছে। আর তা ছাড়া সরকার তো সবে তৈরী হ'য়েছে—তার গুছিয়ে নিতে কিছুটা সময়ওতো লাগবে!"

মঙ্গরু জবাব দেয় খুব আস্তে আস্তে, "হাঁ সময় লাগবে কিন্তু মালিকদের ভাল করবার জন্যে সময় লাগছে না তো সরকারের—এই তো দেখ কাপড়ের বেশী পয়দা হোয়েছে বলে কাপড়ের কল বন্ধ করে দিচ্ছে কিন্তু তুমি আমি কাপড় কিনতে পারছিনা। অথচ মালিকরা একশো কোটি টাকার উপর মুনাফা লুটেছে তা কি সরকার দেখতে পায় না?—সরকার সবই দেখে কিন্তু আমাদের জন্যে তারা কিছু করবে না। এ সরকার ধনীদের জন্যে হ'য়েছে। এর বিরুদ্ধে যে বলবে তাকেই গ্রেপ্তার করা হবে।

ওদিকে মুঙ্গলীর গানের আসর জমে উঠেছে। মুঙ্গলী জাতে আহির। সত্যযুগ থেকে আজ পর্যন্ত আহিরদের মধ্যে বীরেরা কি ভাবে লড়েছে সেই চানাইনী গান। নারকোল দড়ির স্তূপের উপর বসে কানে হাত দিয়ে গাইছে মুঙ্গলী।

রাম রাম রাম·········বলে তার গান শুরু হয়। মাঝে হাঁক ছাড়ে আর উপস্থিত সবাই একসঙ্গে আওয়াজ দেয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে এই গান। মুঙ্গলীর ঠাকুর্দা ছিল গ্রামের সেরা গায়ক। ওর ধারণায় সরস্বতী প্রত্যেকের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে গলায় বাসা বাঁধে। এই বীরত্বের এবং লড়াইয়ের গান শুনতে মজুররা খুব ভিড় করে বসে। একমাত্র ফাগুয়া ছাড়া সঁইয়া, ননদৈয়াদের রসের গান বড় একটা গায় না আজকাল। কারণ সেগুলো মনের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না।

টিফিন শেষের ঘণ্টা পড়ে গেল। কাজ শুরু হয়ে হঠাৎ উত্তর দিক থেকে করুণ চিৎকার ভেসে এলো। সবাই তাকিয়ে দেখলো যে ওয়ার হাউসের সামনে অনেক মানুষ ভিড় করেছে। হৈ হৈ করে সমস্ত মানুষ

সে দিকে ছুটলো। জেটির রেশন দোকানের নিরীহ কেরানি বাবুটি নাকি মারা গেল। ওয়েয়ার হাউসের বরান্দা দিয়ে যাবার সময় ঘাড়ের উপর নিউজ প্রিন্টের রোলার পড়েছে দড়ি ছিড়ে। চোখ ছুটো ফেটে রক্ত বেরিয়ে গেছে। সেই বীভৎস দৃশ্য আর কেউ দেখতে পারে না। একবার দেখেই ফিরে চলে আসে। ঐ খোলা বারান্দাটার উপর দিয়ে হামেশাই লোক চলাচল করে থাকে। তাদের মানা করে না কেউ কোন দিন; অথচ মাথার উপর চলছে কাজ। গত বছর ক্রেনের চাকায় জড়িয়ে একজন মারা গিয়েছিল।

আপসোস করে বললো মঙ্গরু, "শালা গোলামের জীবনের কি দাম এখানে —প্রত্যেক বছরই এমনি মারা যাচ্ছে কত লোক—কোন ব্যবস্থা নেই। এ সব আমাদের গা সওয়া হ'য়ে গেছে যেন। মরতো যদি একটা অফিসার তা'হলে দেখতে একবার ছুটোছুটি। এর বেলায় হয়তো ওর মা বউ একটু কাঁদবে—আমরা একটু উ আ করব বাস্ তারপর একটা ঝুটা ইন্‌কোয়ারী বসবে—বলে দেবে ওর দোষেই ও মারা গেছে। অমানুষ করে দিচ্ছে আমাদের ওই হারামির দল—। ওদেরই ষড়যন্ত্রে হাজার হাজার গরীব মানুষ কাটা পড়েছে দাঙ্গার সময়—তাতেও আমাদের দিলটা জ্বলে যায় নি—মানুষের জিন্দেগীর দাম এত কমে গেছে!" জেঠির দিকে ফিরতে ফিরতে উত্তেজিত হ'য়ে বলছিল মঙ্গরু। চুপচাপ শোনে মজুররা।

নিরীহ ভাল মানুষ বাবুটার হাসি মাখানো মুখটা জ্বল জ্বল ক'রছিল প্রত্যেকের মনে—আর একটু একটু বিক্ষোভের আগুন জ্বলছিল...... বীভৎস রক্তাক্ত চোখ ছুটোর কথা ভুলতে পারে না কেউ। শেষ বেলাটা কাজে মন লাগে না কারুরই। আজকের ঘটনাটা ছাই চাপা আগুন উস্কে দেয় খোঁচা দিয়ে। ছুটির ঘণ্টা বাজে—অন্যদিনের মত আজ আর চেচামেচি করে না কেউ। প্রায় নিঃশব্দে বাড়ীর দিকে রওনা হয় সবাই। মঙ্গরুর মনের মধ্যে এখনও সেই রক্তাক্ত চোখের করুণ দৃষ্টি ভাসছে। রেলওয়ে, চটকল,, জেটি আরও নানারকম কারখানা থেকে মজুররা বাড়ী ফিরছে। সারাদিনটা কিভাবে কেটেছে তা বোঝা যায় তাদের মুখের দিকে তাকালেই। মনে হয় যেন একটা পেষাই কলের মধ্যে ফেলে শরীরের শক্তির একটা মোটা অংশ নিংড়ে নেওয়া হয়েছে।

বাজারে এখন একটা বিক্রির ধুম পড়বে। কালীবাবুর বাজারের এপাশে নিম্ন শ্রেণীর বেশ্যালয়গুলোর সামনে এক একটা ল্যাম্প জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক একটা মেয়ে মানুষ—এ সময়টা ওদেরও এ মরশুম পড়ে। একটু দূরে বাংলা মদের দোকানে ভীড় জমেছে। চটকলের হপ্তা মাইনে পাওয়া মজুররাই বেশী আসে এখানে—জেঠির মজুরদের মধ্যে কয়েকজনের ভাড় ববান্ধ আছে—কেউবা পরব উৎসবে খায়।

গোলাম জীবনের তিক্ততা আর বিক্ষোভ চাপা দেয় এক ভাড় মদ, একটু মেয়ে মানুষের সঙ্গ। তারপর আকাঙ্ক্ষাটা বাড়বে। একটু একটু করে এগিয়ে যাবে যতদিন না ভেঙ্গে যাবে ওদের মেরুদণ্ড—আসবে অকাল বার্ধক্য। অথবা রোগে মুখ থুবড়ে মড়ে থাকবে অসহায় অবস্থায়।

আগে জেটির মজুরদের বড় একটা অংশ এদিকে ঝুঁকে পড়েছিল কিন্তু বছর দুই তিনেকের মধ্যে তাদের জীবনে এসেছে একটা বিরাট পরিবর্তন রামধনীর চেষ্টায়। তবু কয়েকজন এখনও ছাড়তে পারে নি। মঙ্গলরাম তাদের মধ্যে একজন। কিন্তু মঙ্গরুকে বড় ভয় করে মঙ্গলরাম। ওর চোখ এড়িয়ে ঢুকতে না পারলে আর যাওয়া হবে না ; কিন্তু পড়বি তো পর একেবারে মঙ্গরুর সামনে।

মঙ্গরু জিজ্ঞাসা করল, "কিরে এখানে কেন ?"

মঙ্গলরাম জবাব দেয়, "এই এমনি একটু সওদা করতে এসেছিলাম আর কি ?" হেসে ফেলে মঙ্গরু বললো, "শালা ঝুটা কথা ব'লছিস্ কেন—যাচ্ছিলি তো ওদিকে।" মুখটা কালো হয়ে যায় মঙ্গলরামের। নিজের বিবেকের সঙ্গে লড়াই করেই ওর মন ক্ষত বিক্ষত, তার উপর মঙ্গরুর ব্যঙ্গ—আরও কাহিল করে ফেলে ওকে।

ওর হাতধরে টানতে টানতে নিয়ে যায় মঙ্গরু। ওকে বোঝায়, "রামনরেশের কি হ'য়েছিল মনে নেই। দেশ থেকে যখন এলো কি তাগড়াই চেহারা আজ দেখ পঙ্গু হ'য়ে গেছে—গা ভর্তি ঘা ফুটে বেরিয়েছে।

মাপ চায় মঙ্গলরাম। দুঃখ হয় মঙ্গরুর। এই শহর হৃদয়হীন—শোওয়া খাওয়া—বউ ছেলেকে রাখবার মত একটু জায়গাও দেয় না। গ্রামের কথা মনে পড়ে মঙ্গরুর। শুধু মঙ্গরুর কেন প্রত্যেকটা মজুরই ভাবে তাদের গ্রামের কথা। মাঝে মাঝে ছুটে যেতে চায় গ্রামে ; শহরকে গালাগালি দেয়। গ্রামের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠে ওরা, কিন্তু অভাবের কথাটা যখন মনে

পড়ে তখন মনে আর সে উৎসাহ থাকে না। কারুরই তিন চার বিঘের বেশী জমি নেই—অনেকের তো একেবারেই শেষ হ'য়ে গেছে। শহরে এসে মেজাগ আর চাল চলন বদলে গেছে। কলকাতার ফেরতা মজুররা দেহাতে গেলে কেমন খাতির পায় তা সবারই জানা আছে। শহরের উপর এই বিতৃষ্ণার মধ্যে টানও আছে আর আস্তে আস্তে সেই টানটাই বড় হ'য়ে উঠছে—দু মাসের বেশী গ্রামে থাকলে প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে।

মঙ্গরুই তো কত বদলে গেছে। সত্য কথা বলতে কি অনেকে টিকিটা এত ছোট করে যে বোঝাই যায় না। মাথা কামানো পছন্দ করে না তার বদলে বড় বড় চুল রাখে। আর সব চেয়ে আশ্চর্য পরিবর্তন—প্রায় সবাই জুতো পরে, জামা গায় দেয়। শহরে এসে আকাঙ্খাটা যেন বেড়েছে সবার।

কিন্তু এক একজন লোক আছে যারা প্রাণপণে গ্রামকে আঁকড়ে থাকতে চায়। নিজের বাড়ীর মধ্যে গ্রামের চাল চলন বাঁচিয়ে রাখতে চায়—বউকে বাড়ীর বাইরে বেশী নিয়ে যেতে চায় না। তবু মুস্কিল বাঁধে—বউ বেঁকে বসে গয়না চায়, বায়স্কোপ দেখতে চায়। শেষ পর্যন্ত হার মেনে শহরের চাল মেনে নিতে হয়। আজকাল কোম্পানি ঘর ভাড়া দেয় বলে অনেকে বউ এনেছে। বড় বড় ঘরে চটের পর্দা টাঙ্গিয়ে কামরা তৈরী ক'রে আছে। মঙ্গরুর জেনানাও আসতে চায় শহরে কিন্তু মঙ্গরু ঘর না পেলে তাকে আনবে না। আসবার সময় জেনানা কাঁদে—কথাটা মনে পড়ে কষ্ট হয় মনে।

বাড়ী ঢুকেই মঙ্গরু দেখলো ওর বাবা ভীষণ চীৎকার করতে শুরু করেছে। বুড়ো আজকাল কথায় কথায় অমনি চেঁচায়। প্রায় প্রত্যেকদিনই আটা চালতে গিয়ে চেঁচাবে বুড়ো। আটার অর্ধেক প্রায় ভুসি—বুড়ো চেঁচিয়ে বলবে, "শালা বলদের খানা—কংগ্রেস রাজা হ'য়ে এই তো হ'য়েছে আমাদের হাল।" মঙ্গরু মনে করল বুঝি অমনি একটা কিছু হোয়েছে কিন্তু ঘরের বারান্দায় পা দিয়ে বুঝলো যে ব্যাপারটা তার চাইতেও গুরুতর কিছু। শেষ পর্যন্ত শোনা গেল যে, বাড়ীওয়ালা কয়েকজন লোক নিয়ে এসে জিনিস পত্তর বের করে দিতে চায়—তার ফলে এই কাণ্ড।

বাড়ীওয়ালা অনেক দিন ধরেই ভাড়া বাড়ানোর কথা বলছিল কিন্তু কেউই দেয়নি। তাই আজ এই আক্রমণ। মঙ্গরুর মাথায় খুন চড়ে গেল। একখানি চেলা কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে ছুটলো বাড়ীওয়ালা গোপী কালোয়ারের

দোকানের দিকে। কিছুক্ষণ বাদেই ওদিক থেকে চেঁচামেচির শব্দ পাওয়া গেল। হাঙ্গামা ফ্যাসাদ পুলিস হুজ্জুতের আশংকায় বুড়ো এগিয়ে গেল। মারামারি আর হয় নি, কয়েকজন লোক মঙ্গরুকে ধরে রেখেছে। রাগে মঙ্গরু এক একবার ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা ক'রছে—গোখরো সাপের ছোবল মারার মত নড়ছে ওর সমস্ত দেহটা।

শেষ পর্যন্ত বস্তির লোকেরা একটা আপস রফা করে দিল। মঙ্গরু যাবার সময় শাসিয়ে গেল যে ফের যদি এরকম কোনদিন হয় তাহ'লে আর কালোয়ারের বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না।

ঘরে ফিরে হাত পা ধুয়ে খাটিয়ার উপর ব'সে পড়ে মাকে খেতে দিতে বলে মঙ্গরু। হঠাৎ নজর পড়লো একখানা বইয়ের উপর। কদিন ধরে বইটা রয়েছে—পড়বার কথা মনে নেই। বইখানা দিয়েছিল ওকে অফিসের কেরানি বোস বাবু। ও খাটিয়া থেকে উঠে বই খানা পেড়ে নিয়ে এলো। বইখানার নাম কমিউনিষ্ট ইস্তাহার। লেখকের নাম কার্ল মার্কস।

কমিউনিষ্ট নামটা খুবই পরিচিত। "রামধনি ভাই তো ঐ দলেরই লোক—" ভাবলো মঙ্গরু। বইখানা পড়তে শুরু করে মঙ্গরু। কিছুদিন হ'ল অফিসের ঐ বাবুটি ওকে বই, সাপ্তাহিক কাগজ দিচ্ছে পড়তে। ও লোকটাকে রামধনীর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখেছে মঙ্গরু। সকাল বেলাকার কথাটা মনে পড়লো "রামধনী ভাইয়ের মত একজন নেতার দরকার—মজুররা প্রতিবাদ ক'রতে চায়।" আবার বই পড়তে শুরু করে। ভাল ক'রে বুঝতে পারে না সব জায়গায়। একটু একটু বোঝে। বেশী দূর পড়াশুনা করেনি মঙ্গরু। পড়ার ইচ্ছে ওর খুবই ছিল—আগে রাস্তায় যে চার পয়সার হিন্দী গানের বই বিক্রি হয় তাই কিনে এনে পড়তো ও। বারান্দা থেকে বুড়ো আড় চোখে ছেলেকে দেখছিল—ছেলের সম্বন্ধে বুড়োর গর্ব আছে। জেঠির মধ্যে ও যে একজন বেশ পাণ্ডা লোক তা বুড়ো টের পেয়ে গেছে। ওর চালচলন দিনকে দিন বদলে যাচ্ছে। আজকাল ওকে একটু একটু ভয় করে বুড়ো।

বুড়োর জীবনের অর্ধেক কেটেছে জাত ব্যবসায় মানে চামড়ার কাজে। তারপর অনেক কষ্টে কয়েক বিঘে জমি করেছিল কিন্তু সে সবই জমিদার খাস ক'রে নিয়েছে। এর পরও সে কিছুদিন গ্রামেই ছিল—এ বাড়ী ও বাড়ী জন খাটতো তারপর খুড়ো শ্বশুরের কাছে কলকাতা বন্দরে

খবর পেয়ে চলে আসে। সেই থেকে বুড়ো এখানেই আছে। বুড়োর সমস্ত জীবনটা কেটেছে গ্রাম্যসমাজের নানা অবিচারের মধ্যে। ব্রাহ্মণ ছত্রিদের উপর তার ভীষণ ঘেন্না; অচ্ছুৎ বলে ও নিজেকে কোনদিন মনে করে নি। এদিক থেকে শহরটা খুবই ভাল লাগে তার। আশ্চর্য লাগে ওর—যখন ও দেখে সেই গ্রামের মানুষের ছুৎ অচ্ছুতের বিচার কত কমে গেছে। গুদোমের মজুররা অনেকেই এ সব বিচার করা ছেড়ে দিয়েছে; এখানে চামারও ব্রাহ্মণ ছত্রি কুলিকে ধমকে দিচ্ছে। গুদোমে অনেকেই চুরি করে, সরাব খায়—মঙ্গরুও দিন কতক খেয়েছিল। কিন্তু আজকাল যেন কেমন হয়ে গেছে মঙ্গরু। বুড়োও ছেলের ভয়ে সরাব খায় না—সেদিন একটু খেয়েছিল কিন্তু ভয়ে ছেলের সামনে আসতে পারে নি।

তন্ময় হয়ে মঙ্গরু বই পড়ে যাচ্ছিল হঠাৎ বাইরে থেকে কে ডাকলো, "মঙ্গরু বাড়ী আছ?" গলাটা চেনা চেনা ঠেকে। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলো সাদা টুপি মাথায় দেওয়া, গোঁপ কামানো একটা ঢ্যাঙ্গা লোক দাঁড়িয়ে আছে।

"কে আপনি"—জিজ্ঞাসা করল মঙ্গরু।

লোকটা হেসে বললো "আরে চিনতে পারছো না?"

এইবার চিনতে পারে মঙ্গরু। আশ্চর্য পরিবর্তন—অতবড় গোঁপটা থাকায় চিনতে না পারারই কথা। মঙ্গরুর বুকটা ফুলে ওঠে আনন্দে—এ লোকটা কাছে এলে মনের বল বেড়ে যায়।

রামধনী আর মঙ্গরু ঘরের মধ্যে গিয়ে বসলো। বইটা পড়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করল রামধনী। আশ্চর্য হয়ে মঙ্গরু জিজ্ঞাসা করল, "আপনি বইয়ের কথা জানলেন কি করে?"

আমি জানি যে বাবু তোমাকে বইখানা দিয়েছে সে হপ্তায় তিনদিন তোমার বাড়ীতে আসবে—তুমি, সাধু, ওয়ার্কশপের রামানন্দ আরও দু একজন মিলে এখানে বসবে—সে তোমাদের বুঝিয়ে দেবে।

রামধনীর সঙ্গে আরও প্রায় ঘণ্টা খানেক কথা হয় মঙ্গরুর। কারখানার মালিকরাই যে প্রকৃতপক্ষে সরকারকে চালায় আর সরকার তাদের সমস্ত স্বার্থ দেখে একথা চমৎকার ভাবে রামধনী বুঝিয়ে দেয়। গরীব আর ধনীর লড়াই কতকাল ধরে চলেছে পৃথিবীর দেশে দেশে—

কিভাবে সমাজবাদ কায়েম হচ্ছে হুনিয়ায়—রুশদেশের মজুর রাজ—চীনের ক্রান্তি এমনি কত কি বোঝায় রামধনী।

রামধনী কিছুক্ষণ বাদে চলে গেল। মঙ্গরু শুয়ে শুয়ে ভাবে। মনের মধ্যে মজুর জীবনের কালো গোলামির পর্দাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে যেন—অনেক রহস্য পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে ওর কাছে। মঙ্গরু বুঝতে পারে কেন রামধনী চাকরি আর সংসারকে তুচ্ছ করে ফেরারি হয়ে ঘুরছে মজুরদের দরজায় দরজায়।

হাতকাটা কালীচরণের মুখটা ভেসে ওঠে মঙ্গরুর মনে। গত ধর্মঘটের সময় পুলিসের গুলিতে একটা হাত কাটা যায় কালীচরণের। তার চাকরি গেছে—রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে কালীচরণ। মজুররা তবু রাগে জ্বলে ওঠে না কেন—কথাটা অনেকদিন ভেবেছে মঙ্গরু!

আজ পরিষ্কার হয়ে গেছে অনেক কিছু—মজুরদের দিমাগ সাফ করে দিতে হবে—খালি মাইনে আর মাগগীভাতার আন্দোলন নয়—রাজনৈতিক আন্দোলন—সমাজবাদ—রুশ-চীনের পথ……। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে—না ঘুমনো চলবেনা পড়তে হবে—বুঝতে হবে। মঙ্গরু ধড়মড় করে উঠে বসে ল্যাম্পটা টেনে নিয়ে বই খুলে বসে……একটু জোরে জোরে পড়ে:

"একটা প্রেত ইওরোপকে ভয় দেখাচ্ছে……কমিউনিজমের প্রেত…।"

রাত্রি গভীর হয়ে পড়েছে।……নিঃশব্দ মজুর পাড়ার মধ্যে নিদ্রাহীন হুটি চোখ তন্ময় হয়ে আয়ত্ত করছে মুক্তির পথ।

* * * *

আজ জেটির মধ্যে সভা হবে—যে করেই হ'ক লোক জড়ো করতে হবে। ভাবতে ভাবতে মঙ্গরু জেঠিতে ঢুকলো।

ওকে দেখেই মঙ্গলরাম চেঁচিয়ে ওঠে, "এই শোন্ শোন্ ভারী মজার ব্যাপার।"

"কি ব্যাপার"? মঙ্গরু জিজ্ঞাসা করে।

"আরে কাল ভগলুকে একটা চুরি কেসে সন্দেহ করে থানায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে দেখে কি যে একটা সন্ন্যাসীকে ধরে নিয়ে এসে বেদম মার লাগাচ্ছে—বলছে সে নাকি ছদ্মবেশী রামধনী। সে যত বলে যে আমি রামধনীটনী কেউ নই—ওরা তত মার

লাগায়। শেষকালে দারোগা বাবু বুঝলো যে ও রামধনী নয় তখন পুলিসদের গালাগাল দিল যে, কাকে তোমরা ধরে এনেছ—তোমাদের যেমন বুদ্ধি……রামধনী না হ'লে আর মার খেয়ে হাউ হাউ করে কাঁদে কে?"

গল্পটা রটে গেল গুদোমের সমস্ত মজুরদের মধ্যে। ভীষণ হাসির ধুম পড়ে গেল। পুলিসের অসহায় অবস্থা দেখে সবাই বেশ খুশী। পুলিসের উপর ওদের রাগটা চিরদিনের। আগে গুদোমের মধ্য থেকে চোর বলে প্রায়ই মজুরদের ধরে নিয়ে যেত। অথচ, সায়েবরা থান থান কাপড়, বাক্স বাক্স কাপড় চুরি করে বেমালুম সরে পড়তো তা পুলিস দেখতে পেত না—এই রাগটা ফেটে পড়ছিল। হঠাৎ মঙ্গরু মঙ্গলরামকে ধমক দেয়, "এই হারামী কাল বই পড়তে যাস নি কেন?" কোন জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই ওকে ধরে নিয়ে মঙ্গরু গুদোমে গুদোমে সভার জন্য প্রচার করতে বেরুল। অফিসের কয়েকজন বাবুও বেরিয়েছিল ওদের সঙ্গে। বিশ্বস্ত লোকগুলোর কাছে বেছে বেছে প্রচার করল ওরা।

ঘুরতে ঘুরতে টিফিনের ঘণ্টা বেজে গেল। ক্ষিদেয় পেট চন চন করছে। আজ সকাল বেলায় যা খেয়েছিল ঘুরতে ঘুরতে সব হজম হ'য়ে গেছে। একপো ছাতু কিনে ও আর মঙ্গলরাম খাচ্ছিল বসে বসে। সারেঙ্গ ভরত তেওয়াড়ী এসে মঙ্গলরামকে আড়ালে ডাকলো। মঙ্গলরাম উঠে যেতেই বললো, "তোমার কি আক্কেল নেই—ঐ চামারের সঙ্গে বসে খাচ্ছ—ছিঃ ছিঃ জেটিতে এসে দেখছি জাতধর্ম তোমরা সমস্তই বিসর্জন দিয়েছ?

মঙ্গলরাম জবাব দিলো তোমার কথাটা ঠিক সারেঙ্গ, কিন্তু বলতে পার জেটিতে কটা লোক মানে—আর তোমরা তো কংগ্রেসের ভক্ত। তা গান্ধীজী তো অচ্ছুৎদের সঙ্গে খেতে বলেছেন কৈ তা তো তোমরা মানোনা—ও তোমাদের কংগ্রেস বুঝি খালি আমাদের একাই ভাঙ্গবার জন্য আর চাঁদা তুলে পতাকা ওড়ানোর জন্য। ওর কথায় সারেঙ্গ চটে গিয়ে বলে, "মনে কর কিছু টের পাই না—রামধনীর জায়গায় বুঝি এবার মঙ্গরু লেগেছে তোমাদের পিছনে—দাঁড়াও না হুদিন জেলে ঘানি টানলেই দম ফুরিয়ে যাবে—ঐ তো রামধনীর অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে—বউটা পক্ষাঘাতে মরছে—খেতে পারছে না। ছেলেটা রয়েছে আর একজনের বাড়ীতে—কি ফয়দা হয়েছে সরকারের পিছনে লেগে।

মঙ্গরু কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল। হঠাৎ ওর মাথায় খুন চড়ে যায়—দৌড়ে এসে সারেঙ্গকে এক চড় লাগিয়ে বলে, "শালা দালাল আজ তোকে খুন ক'রে ফেলব। লেবার অফিসারের সঙ্গে যে তুমি ফুসফাস কর তা বুঝি আর কেউ জানে না ?"

সারেঙ্গের উপর অনেকেই খাপ্পা ছিল। ঢিলা কাজ করে বলে অনেকের নামেই সে রিপোর্ট ক'রেছে। কয়েকজন দৌড়ে এসে আরও গোটাকতক কিল চড় লাগায়। রামধনীর নিন্দে অনেক দিনই ওরা শুনেছে, কিন্তু ভয়ে কিছু বলতে পারেনি। সারেঙ্গ পরিত্রাহি চেঁচাতে শুরু করে।

গোলমাল দেখে সায়েবরা দৌড়ে এলো। তারপর রিপোর্ট লেখা ইত্যাদি হ'লো প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে।

মঙ্গরু ইতিমধ্যেই সভার জায়গায় চলে গিয়েছিল। অনেক দিন বাদে সভায় অনেক লোক এসেছে। দেখে বেশ খুশী হয় মঙ্গরু। ডক থেকে একজন এসেছেন, তিনি বক্তৃতা দিবেন।

মঙ্গরুর মনে চলছে প্রচণ্ড দ্বন্দ। সারেঙ্গ মারার ফল কি হ'তে পারে। এক একবার সভায় কিছু বলতে ইচ্ছে হ'চ্ছিল ওর কিন্তু পুরো সাহস হয় না এগোতে। আজকের মারামারির ঘটনাটা বক্তার কানে কানে বলে দেয়।

বক্তা ঐ ব্যাপারের উপরই বক্তৃতা করলেন। দালালরা মজুরদের একাই কি ভাবে ভেঙ্গে দিয়েছে—দালালদের পিটানোর পর অন্যান্য কারখানায় কি ভাবে সংগঠন গড়ে উঠেছে।

ভরত তেওয়ারীর মার খাওয়ার খবরটা ইতিমধ্যেই রটে যাওয়ায় দালালরা সভায় আসে নি। মজুররা খুব উৎসাহ নিয়ে ফিরে গেল।

আজকের মিটিংয়ের ফলাফল দেখে আগামী কাল তক্তাঘাটের সভায় লোক জড়ো করা সম্বন্ধে আশা হ'ল মঙ্গরুর।

কাল বেশী লোক হ'লে রামধনী বক্তৃতা দেবে। আর তা'হলেই পুলিশ তাকে ধরবার চেষ্টা ক'রবে। তার আগেই মজুরদের প্রস্তুত ক'রে রাখা সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে মঙ্গরু গুদোমে ফিরে এলো।

বোসবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন মোবাইল ক্রেনের পাশে। ওকে দেখেই বললেন, "মঙ্গরু একটু দাঁড়াও কথা আছে।"

মঙ্গরু দাঁড়ালে বোসবাবু বললো, "আমাদের ওখানে যে কজন বই

পড়ছে সবাইকেই আমি আসতে বলেছি—ছুটির পর বস্তি বস্তি ঘুরে কালকের সভার জন্য প্রচার ক'রব। আর শোন বীরেন বাবুকে ময়দানের সভা থেকে কাল ধরে নিয়ে গেছে। তাকে এমন মেরেছে যে বাঁচে কিনা সন্দেহ। এ কথাটাও প্রচার ক'রবে।

কথাটা শুনে ভেতরটা জ্বলে যায় মঙ্গরুর—বন্দরের নেতাদের মধ্যে কেউ আর অক্ষত রইল না। শর্মা বাবুকে জেলে গুলি ক'রেছিল—তার ঘা এখনও সারে নি···সিতাংশু বাবুর যক্ষা রোগ ধরেছে...রামবাবুর চার পাঁচটা ছেলেমেয়ে না খেতে পেয়ে মরতে বসেছে।

প্রচণ্ড ঘৃণায় সমস্ত শরীর রি রি ক'রে ওঠে।

তক্তাঘাটের সভায় অনেক মজুর এসেছে—মাইনে ওয়ালা, মেরিন শ্রমিক, লোকো ড্রাইভার—প্রায় সব সেকশনের লোক। কিছু কেরানি বাবুরাও এসেছেন।

গঙ্গার ধারে রেলওয়ে গুমটির সামনের ময়দানে সভা বসেছে। একজন বক্তার বক্তৃতা দেওয়ার পর হঠাৎ ভিড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো রামধনী। টেবিলের সামনে দাঁড়াতেই সভায় গুঞ্জন উঠলো—রোমাঞ্চ লেগেছে যেন সবার মনে। এই লোকটা সম্বন্ধে নানা গল্প শুনেছে অনেকেই—কেউ কেউ বা দেখেছে।

মঙ্গরুর মনের মধ্যে যেন তোলপাড় করছে। যদি পুলিস আসে কি কিভাবে বাঁচাবে তাকে, এই চিন্তাটা ওকে পেয়ে বসেছে। বক্তৃতাটা শেষ পর্যন্ত হ'লে মজুরদের সংগঠন করতে সুবিধা হবে।

ইউনিয়নের একজন নেতা এখনও আসেন নি। তার কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ ক'রছে—কয়েকজন মজুর একপাশে বলাবলি ক'রছিল। মঙ্গরু লাফিয়ে উঠে আওয়াজ তোলে, "কমরেড রামধনী······" হাজার হাজার গলায় ফেটে পড়লো, "জিন্দাবাদ !"

রামধনী বক্তৃতা দিতে শুরু করে, "ভাইরা, অনেক দিন বাদে আজ আমি আপনাদের সামনে হাজির হ'তে পেরেছি। আপনাদের সঙ্গে যদিও বরাবরই আছি কিন্তু এতবড় সভায় হাজির হ'তে পারিনি।...সরকার আমাদের কণ্ঠরুদ্ধ করতে চেয়েছে কিন্তু মজুরশ্রেণী তাকে চূর্ণ করে······।"

এই পর্যন্ত বলতেই কে একজন চেঁচিয়ে উঠলো, "পুলিস আসছে।" সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো জনতা—অনেকের মনে একটু আতংকের ভাব। কেমন

একটু এলো মেলো হয়ে পড়ে সবাই। মঞ্চের উপরে বসা নেতারা যেন কি করবে ভেবে পায় না।

সাত আট গাড়ী বোঝাই সশস্ত্র পুলিস ঘিরে ফেলে সমস্ত সভা। আর চিন্তা করবার অবসর নেই—যা হয় এখনি সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠল মঙ্গরু—ভাইসব উঠে দাঁড়ান। তার গলায় বজ্রের শব্দ যেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রের সেনাপতির অমোঘ আদেশের মত শোনালো তার আহ্বান।

সমস্ত মজুর উঠে দাঁড়ালো। রামধনী মঞ্চের উপর থেকে লাফিয়ে পড়লো ভিড়ের মাঝখানে। দৌড়ে পালাতে গিয়ে দেখে সামনে পুলিস এসে পড়েছে। উপায় না দেখে গুমটি ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়ে রামধনী—দরজা বন্ধ করে দেয়।

পুলিস ইন্‌সপেক্টর দৌড়ে এসে দরজার সামনে রিভলভার খুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, "এইবার পেয়েছি বেটাকে—অনেক ভুগিয়েছে!"

মঙ্গরু একপা দুপা করে ইনসপেক্টরের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে কখন। হঠাৎ ইনসপেক্টরকে জাপটে ধরে মঙ্গরু—সেই মুহূর্তেই রামধনী চট করে দরজা খুলে ফেলে রাইফেলধারী সিপাইটাকে এক লাথি মারে। সে পড়ে যেতেই আর একজন সিপাহী এগিয়ে আসে—সেও কনুয়ের ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে। একলাফে রামধনী গঙ্গায় লাফিয়ে পড়ে। মঙ্গরুও সরে পড়ে গোলমালের মধ্যে।

রিভলবারের কয়েকটা গুলি মঙ্গরুর কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। কয়েকটা কাঁদুনে গ্যাসের সেল ফাটার শব্দ শোনা গেল—একটা ভীষণ বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা যায়। সভাটা যেন ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে। এলোমেলো হ'য়ে ছিটকে পড়ছে মানুষ।

হেস্টিংসের চৌমাথার উপর একখানি লড়ি জ্বলছে। অন্ধকারের মধ্যে লালচে আগুনের লক্‌লকে শিখাগুলো ভীষণ রাক্ষসীর আগুনে-চুলের মত হাত বাড়িয়ে নাচে আনন্দে। আলোর ছটা পড়ে মানুষগুলোর মুখের চেহারা হয়েছে ভীষণ।

ভীড়ের মধ্যে কোন ফাঁকে মঙ্গরু বেরিয়ে গিয়েছে। ওর সমস্ত ভা কোথায় পালিয়ে গেছে আজ। গ্রেপ্তার, লাঠি, গুলি সব যেন আজ তুচ্ছ মনে হয়। কিন্তু ধরা দিলে চলবে না—সামনে অনেক কাজ……প্রত্যেকটি

মজুরকে সমাজবাদী ধারণা দিতে হবে। বোসবাবুর কথাটা মনে পড়ে, "নেতা হ'তে হবে।" গঙ্গার ধার দিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটে মঙ্গরু। লঞ্চে গঙ্গাপার হ'য়ে বাড়ী যাওয়ার জন্য বাবুঘাটে যায়। কানটা চিন চিন করে—হাত দিয়ে দেখে গুলি লেগে খানিকটা ছিড়ে গেছে।

হঠাৎ গঙ্গার বুকে সমস্ত জাহাজ আর লঞ্চ তীব্র সিটি দিয়ে উঠলো। জোয়ার আসছে………। সাগরের বুকে জেগেছে মহা জোয়ার, তারই আঘাতে গঙ্গার জল ফুলে উঠেছে সোঁ সোঁ শব্দে। পাঁচহাত উঁচু জলের দেওয়ালটা রামকেষ্টপুরের পণ্টনটাকে যেন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল। জাহাজগুলোর শেকল ঝন ঝন করে উঠলো। টান খেয়ে উল্টে পড়লো কয়েকখানা নৌকা। শৃঙ্খল ছিড়ে যাবার আর দেরী নেই।

মঙ্গরু জোয়ার দেখে……আর এক জোয়ার এসেছে তার মনে…… বন্দরের মজুরদের মনে।

দীনবন্ধু দে

সাহিত্যে তথাকথিত ‘তৃতীয় শিবির’

ভারত এবং পাকিস্তানে আজ যখন তীব্র শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর সব রকম চক্রান্তকে আক্রমণ ক’রে পরাস্ত করতে করতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিরাট গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তখন বুর্জোয়াশ্রেণী এবং তাদের দালালরা নানাআকারে মরিয়া হ’য়ে উঠছে। একদিকে লাঠি গুলি জেল দমননীতি বিভেদনীতি দাঙ্গানীতি, অন্যদিকে সেটাকেই একটু ভোল বদলে বামপন্থী পোষাক ধরিয়ে তথাকথিত ‘তৃতীয় পক্ষ’ হিসাবে উপস্থিত করা হচ্ছে। তথাকথিত তৃতীয় পন্থীদের কাজ হ’ল বুর্জোয়া-বিরোধী ভূমিকার ভাণ ক’রে মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা, সমাজতন্ত্রী ভূমিকার ভাজ ক’রে শ্রেণীসংগ্রামকে পিছন থেকে ছুরী মারা এবং ‘গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের’ (!) বুলি নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে আক্রমণ। যেহেতু এই তথাকথিত ‘তৃতীয় পক্ষীয়’ সমাজতান্ত্রিকদের (!) আসল কাজই হ’ল বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থাকে প্রাণপণে টিকিয়ে রাখা, সেইজন্য এরা শ্রেণীসংগ্রাম, শ্রমিক-নেতৃত্ব এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে যমের মত ভয় করে! কারণ এরা জানে শ্রেণীসংগ্রাম, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব এবং শ্রমিকের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বানচাল করতে পারলেই সমাজতন্ত্রের বারোটা বেজে যাবে, টিটো-মার্কা ফাশিজমের পথ পরিষ্কার হবে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা সৃষ্টি ক’রে মানুষকে ভুলিয়ে তাদের আবার একটা বিশ্ব-যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়া যাবে। কিন্তু এদের মৃত্যুদিন দ্রুত ঘনিয়ে আসছে।

এরা সাহিত্য ক্ষেত্রে ‘তৃতীয় পক্ষের’ দালালি সংগঠিতভাবে চালাবার জন্য সম্প্রতি জোট বেঁধে একটা সংঘ গড়ার চেষ্টা করেছে—‘পক্ষ’ ঢেকে রাখার জন্য মোলায়েম ক’রে তার নাম দেওয়া হয়েছে, “সমকালীন সাহিত্য সংঘ।” বুর্জোয়াদালালির সনদ হিসাবে এরা যে দু’টো প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তা একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ুন, তা’ হলেই চটকদার কথার পেছনকার কদর্য চেহারা ধরতে পারবেন। এই কৌশলটা যদিও খুব পুরাতন তবু এরা হালছাড়ার পাত্র নন।

পুরো প্রস্তাব দু’টো নিচে দেওয়া হল :

“সমকালীন সাহিত্য সংঘের এই সভা একান্তভাবে বিশ্বাস করে যে, সাহিত্য ও শিল্পকে যে কোন প্রয়োজন সাধনেই ব্যবহার করা হ’ক না কেন, তার একটা আপন মূল্যও (!) আছে। এই স্বাশ্রয়ী-মূল্য (!) থেকে সাহিত্যিক ও শিল্পী তার নিজস্ব প্রেরণার প্রতি অখণ্ড নিষ্ঠা রেখে রচনা সৃষ্টির অধিকার পান; এবং এ তাঁর মৌলিক অধিকার। এ অধিকারের উপর যদি আঘাত পরে সে আঘাত পড়বে সাহিত্য ও শিল্পের উপরই। এ অধিকারের দাবি যদি ত্যাগ করেন শিল্পী তিনি তাঁর দায়িত্বকেই অস্বীকার করবেন। (দায়িত্বের গার্জিয়ান!)।

“এই কেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে একথাও বিশ্বাস করে যে, সাহিত্যিক সমাজেরই একজন এবং সেই হিসাবে আর দশজন কর্তব্যবুদ্ধি সম্পন্ন (?) নরনারীর সঙ্গে তাঁকে সমাজকল্যাণের (?) পথ খুজতে হবে। এই অন্বেষণা তাঁর ব্রতস্বরূপ হবে; তাঁর ব্যক্তিত্বকে (!) উদ্বুদ্ধ করবে, স্বাভাবিক আবেগেই (!) সঞ্চারিত হবে তাঁর সৃষ্টি প্রেরণায়। ফলে আপন মনের সম্পূর্ণ সায় নিয়ে যা কিছু রচনা করবেন শিল্পী ও সাহিত্যিক তাতেই এই সার্বিক কল্যাণ কামনার (??) রূপটি ফুটে উঠবে।”

দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয়—“বর্তমানে শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও গোষ্ঠিচক্রের কঠোর শাসন প্রবর্তনের যে চেষ্টা দেখা যাচ্ছে তাতে আমরা বিশেষ বিচলিত (!) বোধ করছি এবং সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ঘোষণা করছি যে, এই হানিকর প্রবৃত্তির আমরা তীব্র বিরোধিতা করি। ফাশিষ্ট পন্থীরা : শিল্প ও সংস্কৃতিকে হস্তগত ক’রে তার যে ব্যবহার করছে প্রকৃত প্রস্তাবে তা মানবতার এবং জীবনের সমস্ত মহৎ মূল্যবোধের (?) শত্রুতাসাধনের নামান্তর বলে আমরা সমবেতভাবে তার নিন্দা করি।

“কমিউনিষ্ট মতবাদের প্রভাবে বিভিন্ন দেশে শিল্প ও সংস্কৃতির ধারা যে ভাবে সর্বগ্রাসী শক্তির (?) অনুশাসনে শৃঙ্খলিত হয়েছে (!!) বেদনার সঙ্গে (?) আমরা তা প্রত্যক্ষ করছি এবং তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছি। (মার্কিনী ঢংয়ে!)

"ক্রমেই আমাদের মনে এ আশংকা বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, ধর্মান্ধতা আর সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির ফলে ভারতে ও পাকিস্তানে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রতন্ত্রের তথা ফাশিষ্টপন্থী ডিক্টেটরী শাসনের উদ্ভব হ'তে চলেছে। (তোমাদের 'স্বকীয়' সাহায্যে !)

"সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণের এই সব প্রবৃত্তির আমরা বিরোধিতা করি এবং যেখানে অধিকাংশ মানুষের দৈহিক দাসত্ব ও আত্মিক বিড়ম্বনার মূল্য মুষ্টিমেয় কতিপয় মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান, সেই সঙ্কীর্ণ সর্বস্বতায় পর্যবসিত পুঁজিতন্ত্রী সমাজের রীতি আমরা গ্রাহ্য করতে চাই না। আমরা আকাঙ্খা করি গণতন্ত্রসম্মত এমন সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে মানুষে মানুষে শোষক ও শোষিতের সম্পর্কের অবসান (?) হবে; যেখানে সৃষ্টিশীল মানুষের যৌথ সহযোগিতার ফলে ব্যক্তির বাধাহীন বিকাশের পথ উন্মুক্ত হবে। সমাজের এই পরিবেশে শিল্পী যে অনাস্বাদিতপূর্ব স্বাধীনতার (!) সুখভোগ করতে পারবেন শিল্পের মহৎ মুক্তির পথে তাকে আমরা বিশেষভাবে অনুকূল বিশ্বাস করি।"

এই প্রস্তাবের বক্তব্য বিষয় তিনটি—কিন্তু তিনটি মিলিয়ে আসলে একটি। (১) সাহিত্যের 'একটা আপন মূল্যও আছে,' তবে সাহিত্যিক সমাজেরই একজন কাজেই তাকে 'স্বাভাবিক আবেগেই' 'সমাজ কল্যাণের' পথ খুঁজতে হবে; (২) কী সেই সমাজ কল্যাণের পথ?—'গণতন্ত্রসম্মত সমাজতন্ত্র,' যেখানে শিল্পী 'অনাস্বাদিতপূর্ব স্বাধীনতার সুখভোগ' করতে পারবে; (৩) এই 'অনাস্বাদিতপূর্ব স্বাধীনতা' এখন ধ্বংস করছে কে? ফাশিষ্ট এবং কমিউনিষ্ট নিয়ন্ত্রণ। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সর্বব্যাপারে স্বাধীনতার প্রশ্নই মূল প্রশ্ন হয়ে হাজির হয়েছে—সাহিত্যের একটা 'স্বকীয়' বা 'স্বাধীন মূল্য' আছে, সাহিত্যিক যা সৃষ্টি করবেন তা 'স্বাধীনভাবেই' করবেন, বর্তমান 'স্বাধীন' সৃষ্টি ব্যাহত করছে ফাশিষ্ট ও কমিউনিষ্টরা (!) সেইজন্য ভবিষ্যতের জন্য চাই 'স্বাধীন' সমাজতন্ত্র (!) বা যাকে বলা হয় গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র। অর্থাৎ স্বাধীনতা চাই, স্বাধীনতা। সমকালীন সাহিত্য সংঘের অন্যতম পাণ্ডা আবু সয়ীদ আইয়ুব পাকা মার্কিন দালালের মত এই 'স্বাধীনতার' ধ্বনি নিয়েই গত দু'বছর ধরে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে বিষ ঢেলে এসেছে।

কিন্তু আসলে এই 'স্বাধীনতার' চিৎকার উৎকট বুর্জোয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদেরও মরণধ্বনি। এই বুর্জোয়া স্বাধীনতার ধারণার সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীনতার ধারণার আকাশ পাতাল তফাৎ। বুর্জোয়াশ্রেণীর এই 'স্বাধীনতার' ধারণাকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়েই শ্রমিকশ্রেণী তার স্বাধীনতার আদর্শকে প্রতিষ্ঠা ক'রে থাকে।

বুর্জোয়ার 'স্বাধীন' শোষণ-ব্যবস্থা এবং 'স্বাধীন' বাজার যতই সংকুচিত হয়ে উঠছে ততই ইঙ্গ-মার্কিন চক্র 'স্বাধীনতার' জন্য মড়াকান্না জুড়ে দিয়েছে অর্থাৎ আমাকে পৃথিবী জোড়া 'স্বাধীন' শোষণের অধিকার দাও। সেই অধিকার দিচ্ছ না বলেই তোমাদের মজুর-কৃষকের দেশ-গুলোতে 'স্বাধীনতা' নেই—আছে শুধু আমাকে খতম করার জন্য উদ্যত একনায়কত্বের ডাণ্ডা! তাঁবেদার সব দেশের হাড়ির খবর পাই, অথচ তোমাদের সব আসল খবরই আমাদের গোয়েন্দেরা জোগাড় করতে গিয়ে বিফল হচ্ছে, কাজেই তোমাদের ওখানে 'স্বাধীনতা' নেই, আছে 'লৌহ যবনিকা'!

প্রতিযোগিতা মূলক ব্যক্তিকেন্দ্রিক বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা থেকেই বুর্জোয়া স্বাধীনতার ধারণার জন্ম। সেইজন্য বুর্জোয়া স্বাধীনতার সংজ্ঞা হ'ল, "অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ না ক'রে যা কিছু করার ক্ষমতাই স্বাধীনতা" অথবা "অপরে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এমন কিছু করার ক্ষমতাই স্বাধীনতা।" বুর্জোয়া যে চব্বিশ ঘণ্টা অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ করছে এবং অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে—কে না জানে সে কথা? কাজেই ঐ সংজ্ঞার অর্থই হল এই যে, তোমরা কেউ যেন কিছুতেই বুর্জোয়ার শোষণের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ না কর, চলতি সমাজ ব্যবস্থা যেন চালু থাকে।

এই রকম বুর্জোয়া স্বাধীনতার স্বরূপকে উদ্ঘাটন ক'রে কার্ল মার্কস লিখেছিলেন:

"এতে মানুষের বিচরণের ক্ষেত্রকে বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে, মানুষকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে; একের উপর অন্যের মিলনের উপর স্বাধীনতার ভিত্তি রচিত হয় নি, রচিত হয়েছে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্বাধীনতার উপর। এই অধিকার সেই বিচ্ছেদের অধিকার, আপনাতে আপনি আবদ্ধ হ'য়ে থাকার অধিকার…স্বার্থপরতার অধিকার…এই ব্যক্তি

স্বাধীনতায় প্রত্যেক মানুষ অপরের মধ্যে তার নিজের স্বাধীনতার বিকাশ দেখে না, দেখে পরিসমাপ্তি। এই ঘোষিত অধিকারগুলো কোনটাই স্বার্থপর বুর্জোয়া মানুষকে ছাড়িয়ে যায় না। বুর্জোয়া যুগের এই স্বার্থপর মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ব্যক্তিগত কামনায় এমনভাবে অন্তর্মুখী হ'য়ে থাকে যাতে মনে হয় সে যেন সমগ্র সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা স্বতন্ত্র জীব।"

নৈরাজ্যবাদ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ষ্টালিন তাদের বুর্জোয়াসুলভ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী ধারণার সঙ্গে মার্কসবাদী ব্যক্তি স্বাধীনতার পার্থক্য দেখিয়েছিলেন এইভাবে :

"নৈরাজ্যবাদ অনুসারে ব্যক্তিকে মুক্ত না করা হ'লে জনতার মুক্তি অসম্ভব। তাই তাদের স্লোগান হল 'ব্যক্তির জন্য সব কিছু'! অন্যদিকে মার্কসবাদের **মূল** কথা হল **জনতা**, তাঁদের মুক্তিই, এই মতবাদ অনুসারে, ব্যক্তির মুক্তির মুখ্য শর্ত। অর্থাৎ মার্কসবাদ অনুসারে জনতা মুক্ত না হলে ব্যক্তির মুক্তি অসম্ভব। তাই তাঁদের স্লোগান : "জনতার জন্য সব কিছু।"

অন্তর্মুখী ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী বুর্জোয়া স্বাধীনতার ধারণা বুর্জোয়া প্রতিনিধি রুশোর ভাষায় প্রকাশ হয়েছিল এইভাবে।

"ম্যান ইজ বর্ন ফ্রি, বাট এভরিহোয়েয়ার ইন চেন্‌স অর্থাৎ কিনা মানুষ জন্মায় স্বাধীন, কিন্তু প্রত্যেক জায়গাতেই সে শিকলে বাঁধা।"

এই বুর্জোয়া স্বাধীনতার আদর্শ বুর্জোয়াকে ফরাসী বিপ্লবের সময় সামন্ততান্ত্রিক শিকল ভাঙ্গার কাজে সাহায্য করেছিল। কিন্তু ক্ষমতা দখলের পর এই 'স্বাধীনতার' আদর্শ দিয়েই বুর্জোয়ারা শ্রমিকশ্রেণীকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা ক'রে আসছে। রুশোর ভুলটা কোথায়?

যে-মানুষ অরণ্যে জন্মায় সে মানুষ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যে স্বাধীনতা পায়, আর যে মানুষ সামন্ততান্ত্রিক অথবা বুর্জোয়া অথবা সমাজতান্ত্রিক সমাজে জন্মায় সে-মানুষ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যে-স্বাধীনতা ভোগ করতে শুরু করে সেটা সবই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। আবার শ্রেণীগত জন্মের পার্থক্যের উপর স্বাধীনতার পার্থক্য আসে। যে-মানুষ যতটা প্রাকৃতিক নিয়ম জগতে জানতে পেয়েছে, আর তার দ্বারা যতটা প্রকৃতিকে (প্রকৃতির অংশ হিসাবে

সমাজ এবং মনকে) বশ করতে পেরেছে সেই পরিমাণে ও পর্যায় মত সে মানুষ স্বাধীন। সেই জন্য মানব সভ্যতার ইতিহাসই হল মানুষের স্বাধীনতা বৃদ্ধির ইতিহাস। এই স্বাধীনতার পরিধি বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়াটাই মার্কসবাদী আন্দোলনের একেবারে মর্মকথা। কিন্তু সে-কথা বুর্জোয়া 'স্বাধীনতা'-ওয়ালাদের মাথায় ঢোকায় কার সাধ্য?

'অনাস্বাদিতপূর্ব স্বাধীনতা' একদিন হঠাৎ পাকা ফলের মত গাছ থেকে পড়ে না। বরং এই ধনতান্ত্রিক অবস্থার মধ্যেই যে পরাধীন দাসের দল তার দাসত্বের কারণ জানবে এবং দাসত্ব থেকে মুক্তির উপায় জানবে অর্থাৎ এক কথায় শ্রেণী-সচেতন হবে সে দাসের অর্ধেক দাসত্ব **ইতিমধ্যেই** খসে পড়ে, অচেতন শোষিত দাসদের তুলনায় সে **ইতিমধ্যেই** স্বাধীন হতে শুরু করে—স্বাধীন ব'লেই জানের পরোয়া না ক'রে সে শোষণের কারাগারে পদাঘাত করে, সে স্বাধীন মানুষের অধিকার, সে লক্ষ লক্ষ দাসদের মনে স্বাধীন মানুষ হবার দুর্দমনীয় ইচ্ছা জাগিয়ে তোলে। এইভাবেই ধনতান্ত্রিক সমাজের জঠরের মধ্যে থেকেই স্বাধীনতার পরিধি বাড়াবার তীব্র সংগ্রাম চলতে থাকে, স্বাধীনতা হঠাৎ আকাশ থেকে পড়ে না। কিন্তু যারা এই স্বাধীনতার পথযাত্রী শ্রেণীসচেতন মজুরের নির্মম শ্রেণীসংগ্রামকে 'অনাস্বাদিতপূর্ব স্বাধীনতা' এবং 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের' নামে পিছন থেকে ছুরি মারে এবং শ্রেণী-সচেতন হ'তে বাধা দেয় তাদের মত স্বাধীনতার এত বড় নির্লজ্জ শত্রু আর কল্পনা করা যায় না। শ্রেণী-সচেতন মজুর যেখানে স্বাধীনতা বৃদ্ধির সংগ্রামে জানকবুল ক'রে নামে সেখানে এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক 'সমাজতান্ত্রিক' দালাল বুদ্ধিজীবীরা পরাধীনতা বৃদ্ধির জন্য আদাজল খেয়ে লাগে। তাই এ দু'য়ের মধ্যে কঠোর সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী।

এঙ্গেলস স্বাধীনতার সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এই ভাবে :

"প্রকৃতিক নিয়ম থেকে মুক্তির স্বপ্নের মধ্যে স্বাধীনতা নেই, বরং এইসব নিয়মকে জানা এবং সেই জানাটা উদ্দেশ্য সাধনের কাজে লাগানোর সম্ভাবনার মধ্যে স্বাধীনতা আছে। বিশ্বপ্রকৃতি এবং যারা মানুষের দৈহিক এবং মানসিক অস্তিত্বকে শাসন করছে তাদের উভয়ের সম্পর্কেই এই কথা খাটে—এই দুই প্রকারের নিয়মকে বড়জোর চিন্তার ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন করতে পারি, কিন্তু বাস্তবের ক্ষেত্রে নয়।" সুতরাং বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান নিয়ে

সিদ্ধান্ত করার ক্ষমতা ছাড়া চিন্তার স্বাধীনতার অন্য কোন মানে নেই। সুতরাং কোন মানুষের সিদ্ধান্তের মধ্যে কতখানি সত্য থাকবে কোন নির্দিষ্ট প্রশ্ন সম্পর্কে সেই মানুষের ঠিক ততখানি স্বাধীনতা......সুতরাং নিজেদের উপর এবং বিশ্বপ্রকৃতির উপর কর্তৃত্বের মধ্যেই স্বাধীনতা, প্রকৃতির নিয়মের জ্ঞানের উপরেই যার ভিত্তি।"

এটাই স্বাধীনতা সম্পর্কে গভীরতম ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক সংজ্ঞা। এই মার্কসবাদী সংজ্ঞার আঘাতে ইওরোপে বহুদিন আগেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী 'স্বাধীনতা'-ওয়ালারা লেজগুটিয়ে পালাতে শুরু করেছে এবং সেই সঙ্গে বহু বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদকে গ্রহণ করেছেন, কারণ তাঁরা দেখতে পেয়েছেন মার্কসবাদই স্বাধীনতার পথে উদ্দাম জয়যাত্রার শ্রেষ্ঠ বাহন। কিন্তু অন্ধের কিবা দিন কিবা রাত্রি।

এইবার বিবেচনা ক'রে দেখা যাক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা শ্রমিক একনায়কত্বকে স্বাধীনতার এবং সাহিত্যসৃষ্টির অন্তরায় বলে রটনা ক'রে আসলে স্বাধীনতাকেই হত্যা করতে আসে—বুর্জোয়ার ধামাধরাদের পক্ষেই এইটা খুব স্বাভাবিক, যাতে শ্রমিকের স্বাধীনতা বাড়ে সেটা এই প্রভুভক্তের দল সহ্য করে কি করে।

"নিয়মকে জানা এবং সেই জানাটাকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের কাজে লাগানোর সম্ভাবনার মধ্যেই স্বাধীনতা"—এই যদি হয় স্বাধীনতা তা'হলে ধনতান্ত্রিক সমাজকে ভেঙে ফেলে দিয়ে পূর্ণ সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলার স্বাধীন পথটা কী?

এই স্বাধীন পথ জানতে হ'লে বা এই স্বাধীনতা পেতে হ'লে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার "নিয়মকে জানতে হবে এবং সেই নিয়মকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের" কাজে লাগাতে হবে। তবেই স্বাধীনতার পথে এক ধাপ আগানো যাবে।

কার্ল মার্কস সেই কাজই করেছিলেন। অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার "নিয়ম জানা"র জন্যই কার্ল মার্কস ২২ বৎসর ধ'রে কঠিন পরীক্ষা ক'রে 'ক্যাপিটাল' বইটা লিখেছিলেন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিয়ম জানা এবং তাকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের কাজে লাগানোর জন্যই

মার্কস-এঙ্গেলস সারাজীবন ধ'রে চেষ্টা ক'রেছেন, পরবর্তীকালে লেনিন সে কাজ করেছেন এবং আজ ষ্টালিনও ঠিক সে কাজই করছেন। কাজেই তাঁরাই স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় যোদ্ধা। স্বাধীনতার এত বড় যোদ্ধা জগতে আর কখনো জন্মায় নি। স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় যোদ্ধা হিসাবেই তাঁরা ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম সম্মানের পাত্র হয়েছেন।

মার্কস-এঙ্গেলস যে অমোঘ নিয়ম আবিষ্কার ক'রেছিলেন সেটা কি? সেটা বিস্তৃতভাবে এখানে বলতে যাওয়া দুষ্কর, সেটা বলা এখানে উদ্দেশ্যও নয়। উদ্দেশ্য শুধু এইটুকু বলা যে, তাঁরা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির আভ্যন্তরীণ বিরোধের অমোঘ নিয়মটা দেখিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে এও দেখিয়েছেন যে, সমাজতন্ত্রের পথে যাওয়ার অমোঘ নিয়ম হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রেণীসংগ্রাম এবং শ্রমিকের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা। এই যদি হয় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রকৃত নিয়ম তা'হলে শ্রমিক একনায়কত্বকে অস্বীকার করা মানেই স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা এবং সেই সঙ্গে সাহিত্যে শ্রমিক একনায়কত্বের নির্দেশ অস্বীকার করা মানেই স্বাধীনতাকে খতম করা, সাহিত্যে বুর্জোয়া ভাবধারা আমদানির আব্দার করা।

মানুষের কাছে হৃদপিণ্ড যা, শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে শ্রমিক একনায়কত্বও তাই। হৃদপিণ্ডকে কেটে ফেলে মানুষকে চিকিৎসা করা যায় না। অথবা বলা যায়, চাবি ছাড়া লোহার সিন্দুকের উপর 'স্বাধীন' ভাবে হাজার মাথা কুটলেও যেমন সিন্দুক খোলে না তেমনি সমাজতন্ত্রের দ্বার শ্রেণীসংগ্রাম, শ্রমিকনেতৃত্ব এবং শ্রমিক একনায়কত্ব ছাড়া খোলা যায় না, ও-গুলো হল সমাজতন্ত্রের চাবিকাঠি, ঐতিহাসিক অমোঘ নিয়ম। তাই মার্কস বলেছিলেন, "বুর্জোয়াদের হাত হ'তে ক্রমে ক্রমে সমস্ত মূলধন কেড়ে নেওয়ার কাজে শ্রমিকশ্রেণী নিজের **রাজনৈতিক প্রভুত্ব** কায়েম করবে।" (হরহরফ আমার—লেখক) শ্রমিকনেতৃত্বে (অর্থাৎ একনায়কত্ব ছাড়াই) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যদি বা সম্ভব, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়নের জন্য দীর্ঘস্থায়ী শ্রমিক একনায়কত্ব একেবারে অপরিহার্য। অবশ্য একনায়কত্বের রূপ বদলায় এবং নানাভাবে তা প্রকাশ পায়। শ্রমিক একনায়কত্বের কোন ব্যাখ্যা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য শুধু এইটা বলা যে, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-ষ্টালিন ধনতান্ত্রিক সমাজের এবং সমাজতন্ত্র গঠনের যে সব নিয়ম আবিষ্কার করেছেন সেটা দীর্ঘস্থায়ী

বৈজ্ঞানিক চেষ্টার ফল, শত চেষ্টাতেও বুর্জোয়া দার্শনিক রাজনীতিকরা তা খণ্ডন করতে পারে নি, বরং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সত্য সারা দুনিয়ায় আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ছে, ইতিহাসের অভিজ্ঞতার আলোকে মার্কসবাদের মূল্য যাচাই হয়ে যাচ্ছে।

সমাজ-প্রকৃতির নিয়মকে অস্বীকার ক'রে 'সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা 'মনের বাসনা' হতে পারে, কিন্তু তা পাগলের প্রলাপ, এবং পাগলের প্রলাপকে কেউই স্বাধীনতা বলে না বরং মস্তিষ্কের বাস্তব অনুযায়ী চিন্তা করার স্বাধীনতা চলে গেলেই পাগলামি আসে। তবু এই প্রলাপোক্তি কেন করতে হচ্ছে? সমাজতন্ত্রের প্রতি আসক্ত লোকদের ভুলপথে ঠেলে দেওয়ার জন্য, বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থা বাঁচিয়ে রাখার জন্য, শোষিত মানুষের পরাধীনতা চিরস্থায়ী করার জন্য। অর্থাৎ 'স্বাধীনতার' বুলি ঝেড়ে এরা স্বাধীনতাকেই হনন করতে চায়, যেমন জয়প্রকাশের পক্ষে বুর্জোয়াকে সমর্থন না করেও, (!) শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বেইমানি করাই একমাত্র কাজ! এই তথাকথিত 'তৃতীয় পক্ষীয়' বুর্জোয়া দালালদের স্বরূপই হল, মায়াবিনী রাক্ষসীর রূপ ধরে এসে সর্বনাশ করা। কি কৌশলে এরা সাহিত্যকে চিরদিন পরাধীনতার শিকলে বেঁধে রাখতে চায় সেটা লক্ষ্য করুন:

সাহিত্যে 'স্বকীয়তার' প্রশ্ন আপাতত বাদই দিচ্ছি—এমন কি এরা যখন বলে, "সাহিত্যিক সমাজেরই একজন এবং সেই হিসাবে আর দশজন (!) কর্তব্যবুদ্ধি সম্পন্ন (!!) নরনারীর সঙ্গে তাঁকে সমাজ কল্যাণের (?) পথ খুঁজতে হবে" তখনও এরা এক অবাস্তব সমাজের কথাই বলছে, কারণ তারা শ্রেণীসত্য এবং শ্রেণী-সংগ্রামকে গোপন করছে, গোপন করছে বলেই এদের রচনায় "সার্বিক কল্যাণ কামনার ছবি ফুটে উঠবে।" সকলের কল্যাণ কামনা ফুটে উঠবে অর্থাৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিও কল্যাণ কামনা ফুটে উঠবে! অর্থাৎ কিনা শ্রেণী-সমন্বয়ের নীতিকে প্রচার করাই এদের সাহিত্যের কাজ হবে। শ্রেণী-সংগ্রাম যে শ্রেণী সমাজকে অহরহ চব্বিশ ঘণ্টা দীর্ণবিদীর্ণ ক'রে দিচ্ছে সেখানে শ্রেণী-সমন্বয়ের 'সার্বিক কল্যাণ কামনা' ফোটানো মানেই এ সমাজের অবাস্তব ছবি আঁকা! এক কথায় মিথ্যার বেসাতি করা। এই মিথ্যার বেসাতির জন্যই এদের চাই 'স্বাধীনতা' এবং এই 'স্বাধীনতা' দিচ্ছে না বলেই এরা "বেদনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ করছে" কেমনভাবে "কমিউনিষ্ট মতবাদের প্রভাবে বিভি

দেশে শিল্প ও সংস্কৃতির ধারা সর্বগ্রাসী শক্তির শাসনে শৃঙ্খলিত হয়েছে।" শয়তানীর একটা সীমা থাকা উচিত। দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করার কায়দায় এরা ঠিক গোয়েবলসের মতই ওস্তাদ। এরা তাই মার্কিন 'গণতন্ত্রের' অ-মার্কিন কমিটির সংস্কৃতি ধ্বংসের বর্বরতম দমননীতির কথা বেমালুম চেপে যায়, শুধু তাই নয় সেটাকেও 'স্বাধীনতার' পরাকাষ্ঠা বলে দেখে এবং ভারতের বুকে শাসকশ্রেণীর সংস্কৃতি দলনের চেষ্টাকে শ্রেণী-সংগ্রামকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে সফল ক'রে তুলতে সাহায্য করে।

শ্রেণী-সংগ্রামের সত্যটিকে গোপন রাখে বলেই এরা যখন ভারতে ও পাকিস্তানে "ধর্মান্ধতা আর সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির" কথা বলে তখন এরা এ-ব্যাপারে বুর্জোয়াশ্রেণীর চক্রান্তকেই গোপন করে, সাধারণ লোককেই দোষ দেয়, কাজেই "ধর্মান্ধতা আর সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি" ঘুচাবার প্রকৃত দাওয়াই দেয় না; বরং শ্রেণী-সংগ্রামকে সাহিত্য থেকে বর্জনের ফলে এরা ঐ জিনিস বাড়িয়ে তুলতেই বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীকে সাহায্য করে, উস্কানি দেয়; এমন কি এদের কেউ কেউ 'স্বকীয়ভাবে' দাঙ্গায় অংশ গ্রহণ ক'রে থাকে। শ্রেণী-সংগ্রামকে বর্জন ক'রে এরা যখন ভারতে ও পাকিস্তানে "ফাশিষ্টপন্থী ডিক্টেটরী শাসনের উদ্ভবের" কথা বলে তখন সেটা লোকের কাছে নিজেদের প্রগতির ভাঁওতা দেবার জন্যই বলে, যাতে ঐ "ফাশিষ্টপন্থী ডিক্টেটরীকেই" ভালমত কায়েম রাখা যায়। এরা শ্রেণী-সংগ্রাম অস্বীকার করে বলেই দাঙ্গা এবং দমন-নীতিটাই লোকের চোখের সামনে তুলে ধরে। এই দিনকানার দল দেখতে চায় না যে, দুকুলপ্লাবী শ্রেণী-সংগ্রামের জোয়ারকেই শাসকশ্রেণী দাঙ্গা এবং দমন-নীতি দিয়ে আটকাতে চাইছে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। দাঙ্গা এবং দমননীতি শাসকশ্রেণীর নিদারুণ দুর্বলতার পরিচয়। এই প্রভুভক্ত কাপুরুষের দল বুঝতে চায় না যে, বিপ্লব চিরকাল অত্যন্ত জটিল অবস্থার মধ্য দিয়েই আসে।

শ্রেণী-সংগ্রামকে এড়িয়ে গিয়ে, সামাজিক বাস্তবকে এড়িয়ে গিয়ে এরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করে তাতে স্বভাবতই ন্যাচারিলজম এবং ফর্মালিজম এসে ভীড় করতে বাধ্য—বিশেষত ফর্মালিজম। কাজেই যে-সাহিত্যে শ্রেণী-সংগ্রাম স্থান পায় তাকে এরা ফর্মালিজমের দিক থেকে আক্রমণ করে, সে-সাহিত্যকে এরা প্রাণপণে হেয় করার চেষ্টা করে। প্রগতি

সাহিত্যিকরা নিশ্চয়ই গভীরতম সামাজিক জটিলতাকে আয়ত্ত করতে অনবরত চেষ্টা করবে, কিন্তু শ্রেণী-সংগ্রামের প্রতি যারা বেইমানি করছে এবং বুর্জোয়া ফর্ম-সর্বস্বতার মধ্যে যারা ডুবে আছে তাদের সমালোচনাকে প্রগতি সাহিত্যিকরা লাথি মেরে সরিয়ে দেবে, শ্রেণী-সংগ্রামের সাহিত্যকে বিন্দুমাত্র হেয় করার চেষ্টার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকবে।

শ্রেণী-সত্যকে যারা গোপন করে, 'স্বাধীনতার' নামে যারা প্রকৃত স্বাধীনতাকে খুন করে তারা তো সাহিত্যের 'স্বকীয়তা' চাইবেই। এই সমাজ নিরপেক্ষ 'স্বকীয়' সাহিত্য যে কাদের ভোগে আসে—সে আমাদের জানা আছে। 'নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধু সুন্দরী রূপসী' 'বস্ত্রহীন' অবস্থায় সমাজ-নিরপেক্ষভাবে বুর্জোয়া ভোগের জন্য চিৎপুরের গলিতে বাস করে, আর বাস করে নগ্ন ছবির আকারে মার্কিন পত্রিকাগুলোতে। 'আর্ট ফর আর্টস সেকের' সেই পুরনো কাসুন্দি না হলে বুর্জোয়া বাবুদের আর চলছে না। সাহিত্যের 'স্বকীয়তা' 'আপন মূল্য' প্রভৃতি বুলির আড়ালে সাহিত্যকে শ্রেণী-নিরপেক্ষ করা বা শ্রেণীর ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়াটা নির্ভেজাল বুর্জোয়া ভাঁওতা। বুর্জোয়ারা নিজেদের শ্রেণীরাষ্ট্রের স্বরূপ ঢেকে শাসন ব্যবস্থা বাঁচিয়ে রাখার জন্য ঠিক ঐ একই বুলি ঝাড়ে। অর্থাৎ কিনা রাষ্ট্রের একটা 'নিজস্ব স্বত্বা' আছে, 'স্বকীয়তা' আছে, 'আপন মূল্য' আছে, রাষ্ট্র হল ধনী-গরীব সকল শ্রেণীর মানুষের ঊর্ধ্বে! প্যাটেল-নেহরু-লিয়াকত তো এই বুলির আড়ালেই "ফাশিষ্টপন্থী ডিক্টেটরী শাসনের উদ্ভব" করছে! বুর্জোয়ারা যেমন রাষ্ট্রের 'স্বকীয়' স্বত্বা প্রচার ক'রে রাষ্ট্রকে শ্রেণীর ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে ফাশিষ্টপন্থী ডিক্টেটরী শাসন' চালায় তেমনি 'স্বকীয়' সাহিত্যিকেরা স্বকীয়তার সাহায্যে সেই শ্রেণীরাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে। বুর্জোয়ার দালাল হিসাবে এদের অহরহ চেষ্টাই হল রাষ্ট্রের শ্রেণীস্বত্বা ঢেকে রাখা। অর্থাৎ তথাকথিত তৃতীয় পক্ষ বলে কিছু নেই, এরা বুর্জোয়া পক্ষের বিভীষণ বাহিনী মাত্র!

লেনিন বুর্জোয়া সাহিত্যিকদের 'স্বকীয়তার' বা দলনিরপেক্ষতার মুখোশ বারবার খুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন : **বুর্জোয়ারা 'দলনিরপেক্ষতার' প্রতি আকৃষ্ট হ'তে বাধ্য, কারণ দল না থাকলে বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনও লড়াইও থাকবে না।**

বুর্জোয়ারা তো এই চায়, লড়াইটা যাতে না হয় সেটাইতো তাদের

পরম কাম্য। তাই দলনিরপেক্ষতার ধ্বনি এত বিপজ্জনক। কারণ দলনিরপেক্ষ সাহিত্যিকরাও একটা দল, তবে তারা ছদ্মবেশী বিভীষণ। এই তথাকথিত দলনিরপেক্ষদের সম্পর্কেই লেনিন বলেছিলেন, Down with non-partisan writers! Down with literary Supermen "দলনিরপেক্ষ সাহিত্যিক ধ্বংস হ'ক! সাহিত্যিক অতি-মানবের দল ধ্বংস হ'ক!"

ভারতে এবং পাকিস্তানে যে-শ্রমিক আজ কংগ্রেস এবং লীগের বুলেটের তোয়াক্কা না ক'রে কলিজার তাজা খুন ঢেলে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাচ্ছে সে নিশ্চয়েই বলবে, দলনিরপেক্ষ সাহিত্যিক ধ্বংস হ'ক! ভারতের এবং পাকিস্তানের যে কৃষকের রক্তে সোনার মাটি লাল হচ্ছে কিন্তু জমির স্বপ্ন আরও জীবন্ত হ'য়ে উঠছে সে বলবে, দলনিরপেক্ষ সাহিত্যিক ধ্বংস হ'ক! যে নিম্নমধ্যবিত্তের কংগ্রেস-লীগ রাজের প্রতি ক্রোধের আগুন চতুর্দিকে ফেটে পড়ছে সে বলবে, দলনিরপেক্ষ সাহিত্যিক ধ্বংস হ'ক! কংগ্রেস-লীগের বুলেটে আহত রাজবন্দীরা বলবে, দলনিরপেক্ষ সাহিত্যিক ধ্বংস হ'ক! বুলেটে নিহত শহীদ কমরেডদের কংকালগুলো থেকে ধ্বনি উঠবে, দলনিরপেক্ষ সাহিত্যিক ধ্বংস হ'ক! ভারত এবং পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যারা গৃহহারা হয়ে বুকে দারুণ জ্বালা নিয়ে পথেঘাটে ঘুরছে তারা বলবে, দলনিরপেক্ষ সাহিত্যিক ধ্বংস হ'ক! জাতিগত বিদ্বেষের যারা শীকার এবং যারা তার বিরুদ্ধে লড়ছে তারা বলবে, দলনিরপেক্ষ সাহিত্যিক ধ্বংস হ'ক! ভারতে এবং পাকিস্তানে বুর্জোয়া চক্রান্তের বিরুদ্ধে শ্রেণী-সংগ্রাম যত তীব্র হ'য়ে উঠবে, রুটি-রুজি-জমি-স্বাধীনতা-গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা যত প্রচণ্ড হয়ে উঠবে ততই এই প্রশ্নও তীব্র হ'তে তীব্রতর হ'য়ে দেখা দেবে—সাহিত্যিক তুমি কোন দলে? আন্তর্জাতিক যুদ্ধের চক্রান্তের বিরুদ্ধে শান্তির সংগ্রাম যত দানা বাঁধছে ততই এ-প্রশ্ন জোরালো হচ্ছে—সাহিত্যিক তুমি কোন ক্যাম্পে? ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র, স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা, যুদ্ধ এবং শান্তির মধ্যে কি নিরপেক্ষ হয়ে বসে থাকা চলে?

চলে না। চলে না, সেই জন্য এই তথাকথিত "তৃতীয় পক্ষীয়" সোশালিষ্ট নেতারা ইওরোপে মার্কিনের মার্শাল প্ল্যান চালু করেছে, সেই জন্যই তারা আটলান্টিক প্যাক্টে নাম লিখেয়েছে, সেই জন্যেই তারা দেশে দেশে শ্রেণীসংগ্রামকে দমন করছে, মালিকের স্বার্থে লক্ষ লক্ষ বেকারবাহিনী সৃষ্টি করছে, সেই জন্যই অ্যাটম বোমা নিষিদ্ধ করতে নারাজ, সেই জন্যই তারা দেশে

দেশে মুদ্রামূল্যহ্রাস মেনে নিয়েছে। সেই জন্যই "তৃতীয় পক্ষীয়" এটলি মালয়ে এবং বর্মায় গণহত্যা চালায়, সেই জন্য ফ্রান্সের সোশালিষ্ট নেতারা ভিয়েৎনামে যুদ্ধ শুরু করে, সেই জন্য ইতালির সারাগাতের "তৃতীয় পক্ষীয়রা" শ্রমিকদের গুলি ক'রে হত্যা করে, সেই জন্য শুমেচার পশ্চিম জার্মানিতে মার্কিন যুদ্ধের ঘাঁটি বানাচ্ছে ; সেই জন্যই তারা সবাই মিলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের চক্রান্তে যোগ দিয়েছে। সেই জন্য আন্তর্জাতিক দুই ক্যাম্প হতে 'নিরপক্ষ' নেহরু সরকার ভারতকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-চক্রান্ত এবং দাসত্বের মধ্যে বেঁধে রেখেছে। আর সেই জন্যই তারা সবাই মিলে আমেরিকার পায়ে দেশের স্বাধীনতা বি।কয়ে দিয়ে 'স্বাধীনতার' বুলি কপচাতে লজ্জা পায় না। কারণ মোসাহেবদের লজ্জা থাকে না।

তাই আবু সয়ীদ আইয়ুবের আটলান্টিক প্যাক্টের সাফাই গাইতে লজ্জা নেই, তাই বুদ্ধদেব বসু ফাশিষ্ট কবি এজরা পাউণ্ডের উপর স্বচ্ছন্দে প্রবন্ধ লেখে, তাই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'থট' প্রত্রিকায় বিনাদ্বিধায় লিখতে পারে, "বাংলাদেশে এমন অবৈজ্ঞানিক লোকও আছে, যে এখনও ম্যালথাসের বৈজ্ঞানিক থিয়োরিকে মানে না!" তাই আন্তর্জাতিক বিপ্লবী শিবির থেকে বিতাড়িত 'দলনিরপেক্ষ' দলহীন মানবেন্দ্রনাথ রায় সম্প্রতি কলকাতায় এসে 'তৃতীয় পন্থা'র জয়ঢাক পটিয়ে কংগ্রেসী কাগজে পাবলিসিটি মারফত বাজার গরম করছে। তাই বুর্জোয়াদের কাগজে লিখে টাকা কামাই করতে এদের লজ্জায় বাধে না, 'স্বাধীনতাও' ক্ষুণ্ণ হয় না, অথচ এঁরা নাকি "পু জিপতি সমাজকে গ্রাহ্য করতে চান না!"

যাঁরা কলে-কারখানায় গ্রামে এবং কারাগারে "পুঁজিপতি সমাজকে গ্রাহ্য করতে চায় না" বলে বীরের মত নিজেদের সম্মান কায়েম করার জন্য বুকের রক্ত দিতে পিছ পা নয় তারা স্বাধীনতার যোদ্ধা নয় যোদ্ধা হ'ল যারা বুর্জোয়ার দালালি ক'রে ক্লীব নপুংশক জীবন যাপন করছে, তারা। এই 'স্বাধীনতার' ধ্বজাধারীরা পরাধীনতার শৃঙ্খল ঝঞ্চনাকেই বকলেস পরা কুকুরের মত সারাদিন বাজিয়ে বেড়ায়।

আসলে ওরা স্বাধীনতার কেউ নয়, ওরা শোষিত শ্রেণীরও কেউ নয়, ওরা কোনও 'শ্রেণীর' লোকও নয়, ওরা শুধু "দশজনের একজন।" তাই এদের কাজ হ'ল "সমাজ কল্যাণের পথ খোঁজা।"

পথ তো তোমাদের খোজার দরকার নেই বাপু! পথ তোমরা

অনেকদিন আগেই পেয়ে গেছ। তোমাদের মত 'স্বাধীন' লেখকদের সম্পর্কেই তোমাদের এককালের প্রিয়লেখক রোঁমা রোঁলা লিখেছেন :

"যারা 'স্বাধীন চিন্তার' জন্য চিৎকার ক'রে থাকেন তাদের ক'জনের এই বিশ্বাস এবং সর্বোপরি এই বিশ্বাসকে বাস্তবে রূপান্তরিত দেখার অন্তরিক উৎকণ্ঠা আছে? এঁদের মধ্যে কয়জন সত্যের সত্যিকারের উপাসক? সর্বস্বপণ ক'রে সংকল্পে অটল থেকে সত্যের শেষ পর্যন্ত যেতে এদের মধ্যে ক'জন প্রস্তুত? বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই যে কর্তব্য পালন করেন নি, দায়িত্বকে অবহেলা করেছেন, স্বাধীনতার নামে স্বাধীন চিন্তাকে জনমতের কর্ণধারগণের দাসত্ব শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করেছেন, তাদের দেওয়া সম্মান ও অন্নকে পরমানন্দে গিলেছেন-এ তো আমি যৌবনকাল থেকে দেখে আসছি। যুদ্ধ আজ এদের মুখোশ খুলে দিয়েছে। এরা যে কতখানি নিষ্ঠাহীন, চরিত্রহীন, যুথবদ্ধ পশুর মত কতখানি স্বাতন্ত্র্যহীন—যুদ্ধের কল্যাণে তা আজ দিনের আলোর মত পরিষ্কার।"

এদের মধ্যে যদি এখনও এমন কেউ থাকেন যিনি না বুঝে 'স্বকীয়তা'র 'স্বধীনতা'র বা 'দল নিরপেক্ষার' দলে ভীড়েছেন, যিনি বুর্জোয়ার স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদকে এখন যাচাই ক'রে দেখতে রাজী আছেন তিনি রোঁলার "I will not rest" বা বাংলায় 'শিল্পীর নবজন্ম' বইটা পড়ে দেখুন। পড়ে দেখুন কী ক'রে ইওরোপের এই মহামনিষী বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে অসংখ্য লড়াইয়ের সামনে থেকেও আদর্শের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদকে ১৫ বৎসর যাবৎ প্রাণ দিয়ে আঁকড়ে থাকতে চেয়েছিলেন, কী ক'রে তিনি ব্যর্থ হলেন, কী ক'রে তিনি তারপর মার্কসবাদে দীক্ষিত হলেন, কী ক'রে শ্রমিক একনায়কত্ব মেনে নিলেন। দেখবেন কী তীব্র হৃদয়যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তাঁকে পার হ'তে হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বিশ্বসত্য আবিষ্কার করে এসে পৌছেছিলেন।

সেই অভিজ্ঞতার বেদনাদায়ক কাহিনী সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

"এই 'স্বাধীন মনস্বী' এবং 'স্বাতন্ত্র্যবাদীদের' এই কয় বছর এত বড় ক'রে দেখে যে ভুল করেছিলাম সে ভুল আমার ভাঙ্গল গভীর আশা ভঙ্গের মধ্যে। বিপদের আশংকা দেখা দিতেই এই মনস্বীদের অধিকাংশই অন্ধকারে আত্মগোপন করলেন……কিন্তু বিশুদ্ধ বুদ্ধিজীবী তো এঁরা নন। জীবনের সঙ্গে কেমন ক'রে আপস করতে হয় তা তারা জানে। চাকর হিসাবে তারা খুবই চমৎকার।.. ...

"......'এক' ও 'সমষ্টি'—এই দুই বিরোধী নীতির সমন্বয় সাধন করেছেন ম্যাক্সিম গোর্কি......আজ রুশিয়ায় তারই চোখের সামনে গড়ে উঠছে এমন এক বৃহত্তর, ব্যাপকতর, বলিষ্ঠতর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যা সমষ্টি জীবনের সঙ্গে সহজেই মিশে যায়, মিশে গিয়ে তাকে উন্নত করে এবং নিজে উন্নত হয়...... ।

"ব্যক্তি ও সামাজিক মানুষের মধ্যে যে মিল আমি বহু বৎসর খুঁজে ফিরছিলাম এবার তার সন্ধান পেলাম। এই যে ব্যাপক দৃষ্টি ও জ্ঞান আমি লাভ করলাম তা আমার ইওরোপীয় বুদ্ধিজীবী সহকর্মীদের মধ্যে প্রচার করার চেষ্টা করলাম......।

"বুর্গোয়া ব্যবস্থার কঠিন মুঠিতে পিষ্ট হয়ে সমস্ত স্বাতন্ত্র্যবাদী সংস্কৃতি আজ মরতে চলেছে। স্থবির কাপুরুষ পাশ্চাত্য সমাজ দীর্ঘকাল ধরে এই বুর্জোয়া সভ্যতার হাতেই নিজের শক্তিশালী মনস্বীদের সঁপে দিয়ে আসছে। আজ এই সমাজের নূতন জন্ম হচ্ছে মজুর-শাসিত উর্বর মাটিতে ; পুরাতন তরু নবজীবন লাভ করছে ; লক্ষ মানুষের প্রাণরসে পরিপুষ্ট হয়ে এই তরু বেড়ে উঠেছে......।"

অবশেষে রোঁমা রোঁলা তাঁর "অতীতকে বিদায়" দিচ্ছেন এইভাবে :

"ঘটনার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলাম সেই আদর্শের সংঘাতকে, যাকে মার্কস অর্থনৈতিক বস্তুবাদের কঠিন নিয়মের নিগড়ে বেঁধে গিয়েছেন, যা আজ পৃথিবীকে দু'টো শিবিরে বিভক্ত করেছে। আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্র ও সর্বহারা শ্রমিক সংঘ—এই দুই দানবের মধ্যেকার গহ্বর দিনের পর দিন বিস্তৃত হ'তে বিস্তৃততর হয়ে চলেছে। বলব কেমন ক'রে এই ঘাতসংঘাতের ফলেই আজ আমি এই গহ্বর উত্তীর্ণ হয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি।"

আমাদের দেশে একদল প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যিক আছেন যারা রোঁলার নামে অনেক সভায় ভাব-গদগদ বক্তৃতা করেও রোঁলার শেষ জীবনের পরিণতি সযত্নে লুকিয়ে রাখে। গান্ধীবাদ, রামকৃষ্ণবাদ, ব্যক্তি স্বতন্ত্র্যবাদ সমস্ত পার হয়ে রোঁলা যেখানে এসে পৌছেছিলেন আমাদের প্রগতিসাহিত্যিকরা সেই অভিজ্ঞতার তীব্র আলোকে 'তৃতীয় পক্ষীয়' বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে ফেলতে দ্বিধাবোধ করবেন না। এমনকি নিজেদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার চিহ্নকেও তাঁরা ক্ষমা করবেন

না—যেখানেই তাঁরা বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে দেখবেন সেখানেই নির্মমভাবে আঘাত করবেন।

সবই যদি নিয়মের নিগড়ে বাঁধা হয় এবং যদি সেই নিয়মকে জানা এবং কাজে লাগানোর চেষ্টাই হয় স্বাধীনতার পরিধি বাড়াবার পথ তা' হ'লে সমাজ এবং ইতিহাসে ব্যক্তির কি স্থান নাই, বীরের কি কোন ভূমিকা নেই, মানুষ কি শুধু একটা যন্ত্রবিশেষ, মার্কসবাদী মানুষেরা কি তা'হলে শুধু যান্ত্রিক কর্তব্য পালন করে? এঙ্গেলসের সংজ্ঞা অনুযায়ী সমাজে এবং ইতিহাসে ব্যক্তি মানুষের বীরত্বের ভূমিকা ষ্টালিন এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

"মার্কসবাদীরা ঘোষণা করেছে যে বীরের দল ইতিহাস সৃষ্টি করে না, বরং ইতিহাসই বীরের দলকে তৈরী করে এবং সেই কারণে বীরের দল জনগণকে তৈরী করে না, জনগণই বীরের দলকে তৈরী করে এবং ইতিহাসকে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। **বীরের দল বা প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষেরা সমাজজীবনে ততটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অভিনয় করতে পারে যতটা তারা সমাজ বিকাশের নিয়ম এবং তাকে উন্নতির পথে পরিবর্তনের পথকে নির্ভুল বোঝার ক্ষমতা রাখেন"**। (বড় হরফ আমার—লেখক)।

ষ্টালিন নিজে এই ক্ষমতার সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী বলে প্রমাণ ক'রেছেন, সেইজন্য তিনিই এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর এবং মহত্তম স্বাধীনতার সৈনিক। তাঁর নির্ভুল পরিচালনাতেই আজ দুনিয়ায় সাম্য এবং স্বাধীনতার জয়যাত্রা দিনের পর দিন দ্রুততর তালে বেড়ে চলছে। তাঁর পরিচালনাতেই তাই সোভিয়েট সমাজ এবং তার শিল্পসাহিত্য সব চেয়ে বেশী স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে এবং সারা দুনিয়ার মেহনতী মানুষকে ঐ স্বাধীনতার পথে উচ্চ হ'তে উচ্চতর সুরে উদ্দাম আবেগে ডাক দিচ্ছে, পথ দেখাচ্ছে। এর ফলেই মার্কিন যুদ্ধবাদীদের প্ররোচনায় 'দল নিরপেক্ষ' দালালরা এত ক্ষিপ্ত হয়ে সোভিয়েট সমাজ, সোভিয়েট সাহিত্য এবং সোভিয়েট নেতার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতে লেগেছে। কিন্তু এদের স্বাধীনতা দমনের এই অপচেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে দেওয়ার জন্য এবং স্বাধীনতার লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রগতিশীল বিপ্লবী সাহিত্যিকরা দিনের পর দিন তথাকথিত 'তৃতীয় পক্ষের' মুখোশ ছিড়ে ফেলবে।

গোলাম কুদ্দুস

বনফুলের মানদণ্ড

হুকুম হ'ল, হেঁটে নদী পার হ'তে হবে, কিন্তু খবর্দার, কাপড় যেন না ভেজে। হুকুম তামিল করতে গিয়ে দেখা গেল জল ক্রমেই বাড়ছে এবং আর এগুলে কাপড় রক্ষা করা যাবে না। কাতর কণ্ঠে প্রশ্ন হ'ল, এখন কি করি? জবাব এল: নদী পার হওয়াটাই আসল, অতএব ভেজাও কাপড়।

বুর্জোয়ার অন্নদাস লেখকদের উপর একসময় নির্দেশ ছিল, সাহিত্যের মারফৎ বুর্জোয়ার স্বার্থের অনুকূলে এবং মজুর ও অন্যান্য মেহনতী মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালাতে হবে এমন ভাবে যাতে 'আর্ট ফর আর্টস সেক' অর্থাৎ উদ্দেশ্যহীন, বিশুদ্ধ সাহিত্যের ভাওতা ধরা না পড়ে। কিন্তু ক্রমেই দিনকাল ঘোরালো হ'তে লাগল, তীব্র ও স্পষ্ট হ'তে লাগল, শ্রেণী সংঘর্ষ। দালাল লেখকেরা দেখলেন, প্রচার কাজ চালিয়ে যেতে হলে ভাওতা রক্ষা করা চলে না। নির্দেশ এল, চুলোয় যাক বিশুদ্ধ আর্টের ভাওতা, চালাও প্রচার খোলাখুলি। সতীলক্ষ্মী গৃহস্থ বধূবেশে গোপনে বেশ্যাবৃত্তি যদি আর না চলে, তবে কব্জিতে গোড়ে মালা জড়িয়ে সদর রাস্তায় এসে দাঁড়াও।

বাংলাদেশে 'বনফুল' সেই শ্রেণীর লেখক যাঁরা 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক' এর ধ্বজা বহন করেছেন দীর্ঘকাল ধরে, সাহিত্যে রাজনীতির গন্ধ পেলে যাঁরা চীৎকার করে ওঠেন, সাহিত্যে রাজনীতির প্রাধান্য দেন বলে যাঁরা মার্কসবাদী লেখকদের প্রায় বাপান্ত করে থাকেন। এহেন ছুৎমার্গী বিশুদ্ধ সাহিত্যিককে হঠাৎ দেখা গেল একখানা শতকরা একশোভাগ রাজনৈতিক উপন্যাস লিখে বসেছেন 'আনন্দবাজার পত্রিকায়'—উপন্যাসের নাম 'মানদণ্ড'। বিষয়বস্তু মজুর আন্দোলন। উদ্দেশ্য কমিউনিষ্টদের বাপান্ত করা। উদ্দেশ্য ঢেকে রাখবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই কোথাও। কোথায় ভেসে গেছে সাহিত্যের অ-রাজনৈতিক বিশুদ্ধতা আর সাহিত্যিকের স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা। বোঝা গেল দিনকাল সত্যিই ঘোরালো হ'য়ে এসেছে, নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করছে ধনী-গরীবের লড়াই। অতএব নির্দেশ এসেছে, মুখোশে যখন অসুবিধা তখন ছিঁড়ে ফেল ওটাকে। নির্দেশ এসেছে, ভেজাও কাপড়।

'বনফুল' শ্রেণীর লেখকেরা এতকাল নিজের নাক না কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গের চেষ্টা করে এসেছেন। কিন্তু এমন দিন এসেছে যখন পরের যাত্রা ভঙ্গ করতে নিজের নাক কাটা ছাড়া তাঁর উপায় ছিল না। এই নাককাটা বনফুলের বীভৎস মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে 'মানদণ্ড' উপন্যাসে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের দয়ায় প্রায়-নিরক্ষর এই বাংলাদেশে উপন্যাস কটা লোকেই বা পড়তে পারে, কতটুকুই বা তার প্রচার ও প্রভাব। তাই মানদণ্ডের উপন্যাসের কাহিনী নিয়ে ছবি তোলা হয়েছে হাজার হাজার টাকা খরচ করে। কারণ, মেহনতী মানুষের মধ্যে সিনেমার প্রভাব ও প্রচার সবচেয়ে বেশী। জনসাধারণের চিন্তাচেতনায় বিষপ্রয়োগের এতবড় উপকরণ বুর্জোয়ার হাতে আর নেই।

বুর্জোয়া তার স্বার্থের তাগিদে যে কতখানি মরিয়া ও বে-পরোয়া হ'তে পারে তার প্রমাণ, এই ছবিখানির বিজ্ঞাপনে সরকারী দপ্তরের সীলমোহর সম্বলিত কাগজে কংগ্রেসী শ্রমমন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের প্রশংসাপত্র ব্যবহার। অর্থাৎ 'বনফুলের' মত বিশুদ্ধ সাহিত্যের গরদের ধুতি পরা একজন সম্ভ্রান্ত সাহিত্যিককে প্রকাশ্যভাবে উলঙ্গ করে বুর্জোয়া ক্ষান্ত হ'তে পারে না, 'বনফুলের' সাথে কংগ্রেসী শ্রমমন্ত্রীর সংযোগটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তবে সে শান্ত হয়। বুর্জোয়ার কাছে তার দালালের প্রেষ্টিজের মূল্য ততদিনই যতদিন এই প্রেষ্টিজ বুর্জোয়ার কাজে লাগে।

ছবিতে 'বনফুল' দেখিয়েছেন ক্যাপিটালিষ্টরা দুই জাতের—ভাল ও মন্দ। ভাল ক্যাপিটালিষ্ট মজুরের সত্যিকারের দরদী অভিভাবক, তার বাপ-মা! মজুরের নৈতিক চরিত্রের প্রতি তার কঠোর দৃষ্টি; তাই মজুরের প্রাণ ধারণের পক্ষে যতটুকু দরকার তার বেশী মজুরী তাকে তিনি দিতে চান না কারণ তাহ'লে তারা নাকি সেটা মদে ও মেয়েমানুষে উড়িয়ে দেবে। এখানে মনে রাখতে হবে, কারখানা চালু রাখবার ও ভবিষ্যৎ মজুর জন্ম দেবার মত দৈহিক সামর্থ্যটুকু বজায় রাখবার মজুরীই ক্যাপিটালিষ্ট মজুরকে দিতে চায় ও তার মেহনতের বাকী অংশটা সে আত্মসাৎ করে এবং এই দিয়েই গড়ে ওঠে ক্যাপিটালিষ্টের পুঁজি। দীর্ঘ শ্রেণীসংগ্রামের পর মজুর আজ একথা বুঝতে শুরু করেছে—তাই মালিক কর্তৃক মজুরের মেহনত চুরির এই অতিস্থূল কৈফিয়ৎ তৈরী করতে হয়েছে মালিকের সাহিত্যিক দালাল 'বনফুল'কে। 'বনফুলের' এই ভালো জাতের

ক্যাপিটালিষ্টের চরিত্র ছিদ্রহীন, অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে ইনি সন্ন্যাসী। অর্থাৎ ইনি কোন নেশা করেন না, স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি নেই। ক্যাপিটালিষ্ট শ্রেণীর পক্ষে এটা বাস্তব বর্ণনা কিনা সে প্রশ্ন না তুলেও 'বনফুলকে' জিজ্ঞাসা করি, নেশা না করেও স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত না হয়ে কি পাপ করা যায় না? মজুরের স্থায্য মজুরী শোষণ করা ও সেই শোষণ ব্যবস্থাকে হিংস্র উপায়ে কায়েম রাখা কি নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের পরিচয়? শোনা যায় গান্ধীর চরিত্র 'নিষ্কলুষ' ছিল, কিন্তু টাটা-বিড়লার হিংস্র শোষণ, শাসন ও অত্যাচারকে যে তিনি কায়েম করে গেলেন, সে কথা ভুলি কি করে? হিটলার নাকি জীবনে মদ ও মেয়েমানুষ স্পর্শ করেন নি; কিন্তু নাৎসী সৈন্য কর্তৃক বিজিত জাতির নারীদের বলাৎকার তিনি হাসিমুখে অনুমোদন করেছেন। কলকাতার রাস্তায় চারজন নিরস্ত্র নারীকে যখন কংগ্রেসী পুলিস গুলি করে মারে, তখন অকলঙ্ক চরিত্র চিরকুমার ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ নির্বাক রইলেন কেন? অর্থাৎ বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ও সমাজ ব্যবস্থার হিংস্র শোষণ ও শাসনের রূপটা যাতে মানুষের চোখে না পড়ে, মানুষ যাতে বুর্জোয়ার ব্যক্তিগত 'অকলঙ্ক চরিত্রের' কাহিনীতেই মুগ্ধ হয়ে থাকতে পারে, তাই 'বনফুল' কর্তৃক মিল মালিকের এই চারিত্রিক জয়গান। তার ভাল ক্যাপিটালিষ্টের জবানীতে 'বনফুল' বলেছেন, অপরকে শোষণ করে ধনী হবার পবিত্র অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে, তবে এই শোষণজনিত দুঃখকষ্ট নিরাকরণের জন্য ধনীকে মুক্তহস্তে দান করতে হ'বে। এই নাকি প্রাচীন ভারতের আদর্শ। আজ যখন প্রত্যেক মেহনতী মানুষ বুঝতে পারছে যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বেঁচে থাকা যাবে না, কারণ সে ব্যাবস্থায় অর্থনৈতিক সংকট ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে, এবং এ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্যই বেকারে দেশ ভরে যাচ্ছে, ছাটাই-মজুরী হ্রাস চলেছে পূর্ণোদ্যমে, বেড়েই চলেছে দ্রব্যমূল্য এবং আরেকটা যুদ্ধের আয়োজন যখন প্রকাশ্যভাবেই, তখন পুঁজিবাদের স্বপক্ষে এই নির্লজ্জ ওকালতি যে কতখানি নৈতিক বিকৃতির পরিচয় তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। সমষ্টিকে শোষণ করে ব্যক্তি বড় হবে; তারপর দানখয়রাত করে সে সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করবে। বলিহারি 'বনফুল', কী অপূর্ব ফুরমুলা। ঝানু ক্যাপিটালিষ্টরা পর্যন্ত আজ যে কথা মুখে বলতে সাহস করে না, দালালের মুখ দিয়ে তা অনায়াসে বেরুল। বোধ হয় এই জন্যই ক্যাপিটালিষ্টদের দালালের প্রয়োজন

হয়। 'বনফুলের' এই ক্যাপিটালিষ্ট আদর্শ পুরুষ শুধু গোঁড়া ধার্মিক নন, তিনি লৌকিক ধর্মে বিশ্বাসী। তিনি জগদ্ধাত্রী পূজা করেন অথচ আধুনিকতম বিজ্ঞানে তিনি সুপণ্ডিত ও জীবাণুতত্ত্বে উচ্চাঙ্গের গবেষণা করেন। ঘুম পাড়াবার জন্য ধর্মের আফিম ও চমক লাগাবার জন্য আধুনিক বিজ্ঞান। 'বনফুলের' বাহাদুরি আছে স্বীকার করতে হবে। এই চরিত্র অঙ্কন প্রসঙ্গে 'বনফুল' জানিয়েছেন, মজুররা যদি এই জাতের মালিককে বিশ্বাস করে ও শান্তশিষ্ট থাকে, তবে হয়ত একদিন এই মালিক উদারতার জ্বালায় অস্থির হ'য়ে কারখানার একটা মোটা অংশ মজুরকে লিখে দিতে পারেন। অতএব ইউনিয়ন, দাবী, ধর্মঘট নৈব নৈব চ। এই ক্যাপিটালিষ্টই "বনফুলর"এর আদর্শ দেশনেতা ও আদর্শ দেশপ্রেমিক।

'বনফুলের' দ্বিতীয় জাতের ক্যাপিট্যালিষ্ট খারাপ ক্যাপিট্যালিষ্ট। কিন্তু যত খারাপ তাকে ভাবছেন তত খারাপ তিনি নন। তিনি প্রথম জাতের মত উদার ও মজুরগতপ্রাণ না হ'তে পারেন তা'হলেও তিনি সহৃদয়, সুরসিক ও সত্যকার শিল্প ও সঙ্গীত প্রেমিক ও তাদের পৃষ্ঠপোষক। তিনি বাড়ীতে তরুণী রূপসী বাইজী রাখেন বটে, তবে আপনি যদি মনে করেন সঙ্গীত উপভোগ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে তাকে রাখা হয়েছে তবে আপনি দারোয়ানের গলা ধাক্কা খাবেন। অর্থাৎ মালিকের ব্যক্তিগত জীবনের লাম্পট্য দেখে উপবাসী মজুর যেন ক্ষেপে না ওঠে, তাই বনফুল বোঝাতে চেয়েছেন বাইজী রাখাটা বড়লোকের লাম্পট্যের পরিচয় নয় আর্টের উপাসনা। এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে আরেকটা মারাত্মক কথা 'বনফুল' বলতে চেয়েছেন। সেটি হ'ল এই: মেহনতকারী সাধারণ মানুষ আর্ট ও সঙ্গীত বোঝে না, বোঝে শুধু ধনী ক্যাপিটালিষ্টরাই। তারাই ওর সমঝদার, তারাই ওর কদর জানে, অতএব তাদের পৃষ্ঠপোষকতা না হলে আর্ট ও সঙ্গীত বাঁচতে পারে না। এখানে 'বনফুল' নদীর জলে নিজের মুখের ছায়া দেখেছেন। সত্যিইত, ক্যাপিটালিষ্টের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া 'বনফুলে'র আর্ট বাঁচবে কি করে?

'বনফুল' বিপ্লবী মজুর আন্দোলনের যে ছবি এঁকেছেন তা ভয়াবহ। মজুরের নিজের কোনও মন নেই, মস্তিষ্ক নেই, চিন্তা নেই, চেতনা নেই— তাকে উত্তেজিত করা সোজা। বুর্জোয়া শাসকেরা, বুর্জোয়া ডিক্টেটররা মজুরকে এই ভাবেই দেখে। আমার মনে হয় মজুরকে এতখানি অপমান এর আগে আর কোন লেখক করেন নি। 'বনফুল' বলেছেন, বিপ্লবী মজুর নেতার কোনও

রাজনৈতিক আদর্শ বা মতবাদ নেই, নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থে ও ঈর্ষায় সে মালিকের বিরুদ্ধে মজুরকে উত্তেজিত করে। সে মাতাল ও বেশ্যাসক্ত। সে তার রক্ষিতার মারফৎ গুণ্ডা সংগ্রহ ক'রে মালিককে আক্রমণ করে। সে প্রচুর সম্পত্তির মালিক, তার কখনো টাকার অভাব হয় না। এই বর্ণনার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বিপ্লবী মজুর আন্দোলনে যে সব মহিলা কর্মী আছেন, 'বনফুল' তাঁদের জানাতে চেয়েছেন যে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, রূপে গুণে, অর্থে ও চরিত্রে বিপ্লবী মজুর নেতা অপেক্ষা ক্যাপিটালিষ্ট অনেক শ্রেষ্ঠ, অনেক বেশী কাম্য—তাঁদের আর্থিক অনটনের সুরাহাও একটা ওখান থেকে হতে পারে অতএব তারা যেন ঐ দিকেই ঝোঁকেন। যাঁরা পথে প্রান্তরে বুক পেতে বুলেট নিচ্ছেন, যাঁরা জেলের ভিতর সম্ভ্রম রক্ষার জন্য অসীম বীরত্বের সাথে লড়াই করছেন, বাংলার সেই বিপ্লবী তরুণীদের কাছে এই ধরনের কদর্থ ইঙ্গিত যে করতে পারে সে যে নৈতিক অধঃপতনের কোন পঙ্কে নিমজ্জিত ভাবলেও গা শিউরে উঠে। এমন কি মজুর আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহিলাদের বাইজী বলে অভিহিত করতে পর্যন্ত 'বনফুলের' দ্বিধা হয় নি। বীণা ভৌমিক ও মৈত্রেয়ী বসু কি বলেন?

'মানদণ্ড' ছবিতে 'বনফুলে'র আই-এন-টি-ইউ-সি'র দালাল বেশ উন্মুক্ত হ'য়ে পড়েছে। যিনি এতদিন নিজেকে রাজনীতির উর্ধ্বে বিশুদ্ধ সাহিত্যের মেঘলোকে আছেন বলে ঘোষণা করতেন তাকে হঠাৎ দেখছি মজুরের বস্তিতে পুলিস মিলিটারীর সহযোগী ধর্মঘট,-ভাঙ্গা গুণ্ডারূপে। তার পেছনে কংগ্রেসী সরকারের বরাভয়, সামনে জি. ডি, বিরলা-নলিনী সরকারের আপ্যায়নের হাতছানি।

কিন্তু শুধু যে সাহিত্যিকের আসল রূপ ধরা পড়েছে তাই নয়, আজকের পুঁজিবাদী সংকটে বুর্জোয়া শিল্প ও সাহিত্য যে কি চরম সংকটের সম্মুখীন ছবিখানি তারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সরোজকুমার দত্ত

জঙ্গী বল্লম

[নীচে যে ছোট গল্পটির অনুবাদ দেওয়া হল সেটি ভিয়েৎনাম জাতীয় বাহিনীর একজন শিল্পী সৈনিকের লেখা। ভিয়েৎনামে আজ যে লড়াই চলেছে তাতে গণফৌজ ভারী কামান থেকে শুরু করে ছুঁচলো বাঁশ পর্যন্ত হাতের কাছে যা কিছু পাওয়া যায় তাই দিয়েই বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছে। গল্পটিতে মুক্তি-যুদ্ধের এই দিকটাই বিদেশী পাঠকের কাছে দেখানো হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ভিয়েৎনামী তরুণেরা যে সহজ বীরত্বের সাথে গাঁয়ে ও শহরে প্রাণ দিচ্ছে, গল্পটিতে তা'ও চমৎকার ফুটে উঠেছে।

—অনুবাদক।]

থান খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আরও তিন দিন অপেক্ষা করে তবে তাদের ইউনিট রওনা হবে ফ্রণ্টের দিকে। এবার যে শত্রুর অনেকগুলো ঘাঁটি চড়াও করতে হবে তাকে একথা ভাল করেই জানা আছে তার। সে জানে, এবারকার লড়াইগুলো হবে ভয়ংকর। মনে পড়ে যায় তার ব্যাক-কন মুলুকে থাকার সময় যে-সব আক্রমণে অংশ নিয়েছিল সে—তার কথা। সেখানে তাকে মরণের মুখোমুখি হতে হয়েছিল কয়েকবার।

মনের গভীর কোণে একটা ভীরু দ্বিধার ভাব অনুভব করে সে, কিন্তু প্রাণ গলে সে-কথা বলতে সাহস পায় না কারও কাছে। ভাবে, তু আর বনের মতো তারও কেন অসুখ হয় না। এই দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু তার পড়ে আছে এখন রেজিমেণ্টের অ্যাম্বুলেন্স হাসপাতালে।

সেইদিনই সন্ধ্যের সময় থান আদেশ পায়—হাসপাতালে বন্ধু দু'জনের সঙ্গে দেখা করে ডেকে আনতে হবে তাদের। রিপোর্ট এসেছে, অসুখ তাদের ভালো হয়ে গেছে। মাঝপথেই তু আর বনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় থানের, ডাকার প্রতীক্ষায় না থেকে নিজেরাই ফিরে আসছিল তারা। পরস্পরকে দেখে তিন নওজোয়ানের মন যে খুশীতে ভরে ওঠে সেকথা বলে দেবার দরকার হয় না। তু আর বনের মুখে চোখে অসুখের চিহ্ন এখনও ফুটে আছে। এমনিতেই তু একটু রোগাটে, আজ তাকে আরও রোগা লাগছে। থানের কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়ে তু বলে: "হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে তোমাকে কাছে পেতে কী ইচ্ছাটাই না করত! আমাদের ইউনিট শুনলাম ফ্রণ্টে যাবার জন্যে তৈরী—সত্যি নাকি? তাই যদি হয় তাহলে তো ফরাসী ঘাঁটিগুলো উড়িয়ে দেবার আর একটা সুযোগ পাওয়া যাবে।"

মুখের উপর আঙ্গুল চাপা দেয় তু, বোঝাতে চায় যে—এ-সব ব্যাপারে

গোপনতা বজায় রাখতে হবে। পরক্ষণেই হেসে উঠে বলে : "কসাইখানায় বধ করাই আমার কাজ, নিজের পেশা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ পাব আমি। ভাবো দেখি কি মজা আমার!"

তুর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে থান। তৃতীয় লড়াইয়ের ময়দান থেকে নতুন আমদানি হয়ে এসেছে সে, স্ফুর্তিবাজ সরল লোক। গত মাসেও সে বাহিনীর আপিসে কাজ করেছে। জঙ্গী ইউনিটে তাকে বহাল করা হয়েছে মাত্র দু'হপ্তা আগে। প্রায়ই অসুখে ভোগে। তার জন্যে ভয় হয় থানের। কল্পনার চোখে দেখতে পায় থান—'আক্রমণ কর' এই আদেশে বাঁশের বল্লম হাতে একজন ফরাসীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে থর থর করে কাঁপছে তু। সে দেখতে পায়, ফরাসীটা তুর হাতিয়ার কেড়ে নিয়েছে, বন্ধুর টুটি টিপে……

চুপ করে থাকে শুধু বন, কথা কম বলে সে, বন কি বীর আর সাহসী। সোহাগ করে একটা লাথি মেরে থান বলে তাকে : "মনে আছে তো, লা-থে'তে সেই ফরাসীটা তোমার ভাইকে কেমন জোরে মেরেছিল, অমনি জোরেই শত্রুর বুকে বল্লম ছুঁড়তে হবে—ভুলো না যেন সে কথা।"

হঠাৎ লাল হয়ে ওঠে বনের চোখ দুটো। কিন্তু মুখে কেবল একটু বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠে, আস্তে মাথা নাড়ে সে।

তু হাসে, দুই বন্ধুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলে : "বল্লম নিয়ে লড়াই ভিয়েৎ-নামেই প্রথম ; খুব মজার ব্যাপার, তাই না ? একথা লোককে স্বীকার করতেই হবে যে, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত শত্রুর বিরুদ্ধে এই আদ্যিকালের হাতিয়ার দিয়ে হামলা করতে পারি আমরা—বুকের পাটা আছে বলেই।… সতি কথা বলতে কি, বন্দুকের চেয়ে বল্লমই আমি বেশী পছন্দ করি। বল্লম হাতে মরাই আমার মনের সাধ।"

বনের মুখ দিয়ে তখন প্রথম কথা বের হয়, "কিন্তু আমার মনের পরম সা হচ্ছে শত্রুর বুকে আঘাত হানা।"

থান ওর মুখের দিকে তাকায়, সন্দেহ হয়……

সবুজ বাঁশ ঝাড়ের তোরণের মধ্য দিয়ে তিন বন্ধু হাটতে থাকে। এ পৌছায় তারা ছোট্ট এক গাঁয়ের প্রান্তে। শীতল ছায়া ঘিরে থাকে তা বাঁধ পর্যন্ত। ইউনিটের ঘাঁটিতে পৌছে আর তারা কথা বলে না।

পথের ধারের ছোট্ট পাহাড়িয়া নদীর কুল কুল শব্দ শোনা যায়।

শুনতে পায় তারা, কে যেন পাথরে ঘসে ঘসে তার বল্লম কিংবা তলোয়ারের ধার শানাচ্ছে।

চোখ বুজে দু'দণ্ড বিশ্রামের সময় এখন। তু আর বনকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় থান তাদের কমাণ্ডারের সঙ্গে দেখা করতে।

কমাণ্ডার ত্রাস ভারী খুশী হয়ে ওঠেন তাদের দেখে। কিন্তু তু আর বনের মুখ এখনও পাংশু দেখে তিনি তাদের বাড়িতে থাকবার জন্যেই পীড়াপীড়ি করেন, ফ্রন্টে যেতে নিষেধ করেন। নাছোড়বান্দা দুই নওজোয়ান, তাদের ফ্রন্টে যাওয়া রুখতে পারেন না কমাণ্ডার। খুশীভরা মন নিয়ে তু আর বন থানের পেছন পেছন তাদের ঘাঁটিতে ফিরে যায়। থান তখন ওদের দু'জনের হাতেই পাঁচ ফুটেরও বড় পাকা বাঁশের একটা করে বল্লম দেয় আর একটা করে লোহার ফলক আর তার বাখারির খাপ।

সোহাগ ভরে বল্লমের গায়ে হাত বুলায় তু, পাহাড়িয়া নদীটার ধারে চলে যায় ফলাটাকে আর একবার শানিয়ে নিতে। শরৎকালের সূর্যটা সবে একটু ঝিমিয়ে পড়েছে। ছোট্ট আঙিনায় বল্লমধারী তুর মস্ত ছায়া পড়ে।

কয়েক মিনিট পরে গাঁয়ের প্রান্ত থেকে একটা গানের তাল ভেসে আসে : "না ফিরেই এগিয়ে যাওয়া……"

বন হেসে বলে : "ঐ তু'র গলা। এই গানটা ওর ভারী প্রিয়।"

* * *

তিন দিন পরে ফ্রন্টের দিকে রওনা হয়ে যায় ওদের ইউনিট। রাত্রে তারা শত্রুর একটা ঘাঁটি আক্রমণ করে। সংকেতের ঘণ্টা বাজতেই ভিয়েৎনামী সৈন্যরা শত্রুর ঘাঁটির দেওয়ালে দেওয়ালে মই লাগায়। দেওয়াল টপকে ঘাঁটির ভিতরে যাবার জন্যে একের পর এক মইগুলো বেয়ে উঠতে থাকে। তৃতীয় দফায় ওঠে থানদের দল। ওদের প্রথম সৈন্য দেওয়ালের উপর উঠতেই বুলেটের আঘাতে গড়িয়ে পড়ে নিচের ভাঙা-কাঁচ-বসানো পাঁচিলের উপর। ভিয়েৎনামী সৈন্যদের মাথার উপর শত্রুর বন্দুকের গর্জন আর বর্ষণ সমানে চলতে থাকে। ভীষণ ভয় পেয়ে যায় থান। দেওয়ালের পিছনে শুয়ে থাকে সে। আর তার বন্ধু দু'জন—তু আর বন—দাঁতে দাঁত চেপে তাদের বাঁশের বল্লম নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর ঘাঁটির উপর। আর্তনাদ আর চিৎকারের মাঝখানে মাথা উঁচু করতেও সাহস হয় না থানের। হঠাৎ আগুনের শিখায় স্পষ্ট নজরে পড়ে তার—কে যেন তার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে দৌড়াচ্ছে।

সাড়া দেয় সে। হাঁপাতে হাঁপাতে লোকটা বলে : "তু গুলি খেয়েছে! এই বল্লমটা তোমাকে দিতে বলেছে সে,—আর বলেছে, এখুনি তুমি চলে আসবে। তার যেন মনে হয়েছে, কাঁটা তারের বেড়া টপকাবার সময় তোমার বল্লমটা খোয়া গেছে।" থানের দিকে বল্লমটা ছুঁড়ে দিয়ে আবার শত্রুর ঘাঁটির দিকে ছুটে যায় লোকটা।

শত্রুর ঘাঁটি তখন জ্বলছে যেন আগুনের সমুদ্র। থান হতভম্বের মতো চেয়ে থাকে সেদিকে।

কয়েকটা বুলেট তার গা ঘেঁসে চলে যায়। গুলির আঘাত এড়াবার জন্যে দুচোখ বুজে গুঁড়ি মেরে পড়ে থাকে সে।

কয়েক মিনিট পরে খুব জোর একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পায় থান। মাটি কেঁপে ওঠে সেই শব্দে। থান দেখে, তার সমস্ত কমরেডরা একের পর এক পিছু হটছে। এতক্ষণে তার মনে সাহস আসে। উঠে পিছু হটা সঙ্গীদের পিছু নেয় সে।

নিজেদের আস্তানায় ফিরে যাবার পথে দেখা যায় সৈন্যদের মধ্যে কয়েকখানা ষ্ট্রেচার—লড়াই চালিয়ে যাবার প্রচণ্ড ইচ্ছা তখনও জ্বলছে তাদের মনে। নিজের দলের কমাণ্ডারের সঙ্গে দেখা হতেই লজ্জার সঙ্গে লক্ষ্য করে থান—তীক্ষ্ণ তিরস্কারে ভরা এক জোড়া চোখ রাত্রির সেই অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করছে, দেখলেই কাঁপুনি ধরে। মৃদু অথচ অর্থপূর্ণ একটা লাথি ঠুকে বন তাকে বলে : "দেওয়াল টপকালে না কেন তুমি?" থান জবাব দেয় না সে কথার। বনের কপালের একটা ক্ষতস্থান থেকে দু'গাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, থান সেদিকে বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বন নিস্পৃহভাবে থানকে তার বল্লমটা দেখায়, মানুষের তাজা খুনের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে আছে সেটাতে। থান চোখ তুলে কি যেন জিজ্ঞাসা করতে যায়। সে কথা বুঝতে পেরে বন্ধু তার কোমল স্বরে বলে, "তু ওখানেই ঘায়েল হয়ে গেল। ভাবতেও পারিনি আমি, এত সাহসী সে……। আমাদের ইউনিটের সব চেয়ে সাহসী যে, তার চেয়েও বেশী সাহস তুর।"

একটা ষ্ট্রেচারের কাছে ছুটে যায় থান। কম্বলে ঢাকা দেহ থেকে তুর উদ্ধত রক্তমাখা চুলগুলো বেরিয়ে আছে। মুদিত তার তরুণ চোখ দুটো। থান ধীরে ধীরে বন্ধুর চুলের মধ্যে হাত বুলায়। চোখ মেলে চায় তু, ম্লান হেসে বলে, "থান, না? আমি ভারী দুঃখিত যে তুমি ওখানে যাওনি। নইলে আরও অনেক শত্রুকে…"

তার গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে আসে। থান অনুভব করে, গলার মধ্যে তার কি যেন একটা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। বনের সঙ্গ ধরার জন্য চুপিসারে উঠে পড়ে সে। ভিয়েৎনামী ফৌজেরা যখন এইভাবে অন্ধকার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে, শোনা যায় নিচু গলায় কে যেন তখন গেয়ে চলেছে : "না ফিরেই এগিয়ে যাওয়া"…এই শপথ বাণীর প্রতিধ্বনি শুনে সমস্ত ইউনিটটাই নিচু গলায় সেই সুরে সুর মিলায়।

থান অনুভব করে, বন্ধুর আত্মত্যাগ তার মনে একটা সাড়া এনে দিয়েছে। লজ্জায় চোখ বোজে সে, তুর বল্লম ধরা হাত দুটো তার আবেগে কাঁপে…।

থানের পাশাপাশি চলতে চলতে বন বিড় বিড় করে বলে : "তু আবার গাইছে। ও নিশ্চয় ভাবছে, এই গান গেয়েই মনের সাধ পূর্ণ হবে।" তুর দুর্বল কণ্ঠস্বর তখনও তার দুই কমরেডের কানে প্রতিধ্বনি তুলছে…।

ভিয়েৎনামী ফৌজ আর একবার রওনা হয় শত্রুর একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি আক্রমণ করতে।

রাত্রির অন্ধকারে পা টিপে টিপে একটু শব্দ না করে জঙ্গী বাহিনী এগিয়ে যায় শত্রুপুরীর দেওয়ালের দিকে। ওদের ঘাঁটির মোটর গাড়ীর আলোগুলো তখনও জ্বলছে তীব্রভাবে। ফরাসী অফিসাররা উদ্ধত স্বরে নিম্নপদস্থদের উপর হুকুম জারি করছে, শোনা যায়। মধ্যে মধ্যেই শোনা যাচ্ছে, সিমেন্টের মেঝের উপর পেট্রোলের ট্যাঙ্ক গড়িয়ে যাওয়ার শব্দ কিংবা সান্ত্রীর বন্দুকে বারুদ ঠাসার আওয়াজ।

মোটর গাড়ীর আলোগুলো তখন নিভিয়ে দেওয়া হয়, জ্বলতে থাকে কেবল পেট্রোলের টিম টিমে বাতিগুলো। সারা শত্রুপুরীটায় থম থম করে একটা নিস্তব্ধতা।

হঠাৎ শত্রুপুরীর ডালকুত্তাগুলো গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে; গর্জে ওঠে আতংকিত মেশিনগান, ঝলকে ঝলকে গুলির বৃষ্টি সারা আকাশটা চষে ফেলে।

শত্রুপুরীতে আগুন লাগে। ক্রমেই দুরন্ত হয়ে ওঠে সে আগুন। শত্রুপক্ষের বন্দুকগুলোর শেষ গর্জ্জন শূন্যে প্রতিধ্বনিত হয়, তারপর নেমে আসে একটা স্থির মৌনভাব। ঘন সন্নিবিষ্ট ট্রেঞ্চগুলোতে যারা লুকিয়ে ছিল শুধু তাদেরই আর্ত কলরব কানে আসে।

পাহাড়ের চূড়া থেকে আক্রমণ করার সংকেতধ্বনি বেজে ওঠে। ভিয়েৎনামী ফৌজেরা ঝড়ের বেগে শত্রুপুরী আক্রমণ করে। উঁচু দেওয়ালের উপর প্রথম যে উঠল সে···সে থান। জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের পটভূমিতে তার ছায়াটা মিলিয়ে যায়। চিৎকার করে ওঠে সে, "আমি ভিতরে পৌছে গেছি, তোমাদের যার বুকের পাটা আছে নিশ্চয়ই সে আমাকে অনুসরণ করবে।"

বল্লম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে শত্রুর ঘাঁটির উপর। উৎসাহের জোয়ারে অন্য সকলেও ঝাঁপিয়ে পড়ে তার পিছনে পিছনে। একটা হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়ে যায়। ট্রেঞ্চের আড়ালে থেকে শত্রুরা গুলি চালাতে থাকে। ভিয়েৎনামী ফৌজ ট্রেঞ্চগুলোর উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে, আর বল্লম দিয়ে শত্রুকে খতম করতে থাকে একে একে। সবচেয়ে সাহসের পরিচয় দেয় থান নিজে। তুর বল্লমকে হাতিয়ার করে সে যেন টেঞ্চের লড়াইয়ে সকলের সেরা হয়ে উঠেছে। চোখের পলকে সে শেষ করে দেয় আটজন ফরাসী সৈন্যকে।

ফিনকি ধারায় শত্রুর রক্ত লেগে তার জামাটা হয়ে উঠে টকটকে লাল। তার নেতৃত্বে তাদের ইউনিটের ফৌজ একটি একটি করে শেষ শত্রুটিকে পর্যন্ত খতম করে তবে ছাড়ে। থান তারপর কমরেডদের এগিয়ে নিয়ে যায় সবচেয়ে কড়া পাহারায় রাখা কাঠের দুর্গটার দিকে। হাতবোমা ফেলে উড়িয়ে দেয় সেখানকার মেশিনগানের দুটো খাঁচা। তারপর আগুন লাগিয়ে দেয় ছাদের উপর। কাঠের দুর্গটা জলদি জলদি পুড়তে থাকে, সে কি প্রকাণ্ড আগুন। শত্রুসৈন্য যতজন ভিতরে ছিল জীবন্ত দগ্ধ হয় প্রত্যেকে। ভিয়েৎনামী সৈন্যদের সম্পূর্ণ জয় হয় কিন্তু জয়ের সংকেতধ্বনি বাজতে না বাজতেই শত্রুর বুলেট এসে বেঁধে থানের দেহে।

ঐ অঞ্চলেই আরও কয়েকদিন থেকে যেতে হয় ভিয়েৎনামী ফৌজদের। প্রত্যেক সন্ধ্যায় বন একবার করে ঘুরে আসে, যেখানে অনন্ত শয্যায় শুয়ে আছে তার বন্ধু দু'জন—তু আর থান। কবরখানা থেকে ফিরতে তার দেরী হয় রোজ, আর ফিরে এসে প্রত্যেকবার বিড়বিড় করে: "মনের সাধ ওদের মিটেছে।"

* * *

বন এখন যে বল্লমটা ব্যবহার করছে সেটা থানকে দিয়েছিল তু।

হো ফুওং

(৩০৮তম কোম্পানী, ভিয়েৎনাম জাতীয় বাহিনী)

ঝড়

"তোমাদের যা বলার আছে, এবার বলতে পার।" কমরেড সরকার তার বক্তব্য শেষ করেন। ছোট ঘরখানাতে আবার নিস্তব্ধতা থম্‌থম্ করতে থাকে।

সকলের হয়ে নীরোদই শুরু করে, "শিবু দাস যদি না থাকে, আমরা নেই। আমরা বুঝ্‌ছি কি, মুখে যতই মজুরের কথা বলা হোক, মজুরের সঙ্গে আমাদের আর সম্পর্ক থাকছে না। আগের দিনে আমাদের একটা কথায় মজুর উঠতো বসতো, '৪৬ সালে এক ডাকে ২৯শে জুলাই হয়ে গিয়েছিল। বাস, ট্রাম, রিক্সা আমাদের কব্জায় ছিল। আমাদের একটা কথায় সারা কলকাতা শহর অচল হয়ে যেত। আর আজ মজুররা আমাদের কথা শোনে না।" একটু থেমে মহেশের দিকে তাকিয়ে আবার শুরু করে নীরোদ, "মুখে মজুরদের নিয়ে সংগঠন গড়ার কথা বলা হচ্ছে, অথচ গত দশ বছরে যা কখনও হয় নি, কলকাতা থেকে একজন ছাত্রকে এখানে পাঠান হল। তার কথামত আমাদের তার সঙ্গে স্কোয়াডে যেতে হচ্ছে, পোষ্টার লিখে আনলে লাগাবার জন্য সঙ্গে ছুটতে হচ্ছে। মুখে মজুরের সংগঠনের কথা বলে শিবু দাসের মত মজুর নেতাকে দল থেকে তাড়ান হচ্ছে। গেটে আমরা দাঁড়াই নি বলে আমাদের ভীরু ভেবে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। আমরা তাই সাফ্ বলে দিতে চাই, আমরা আর লালঝাণ্ডার সঙ্গে নেই। শিবু দাস যদি না থাকে, আমরাও নেই।"

লম্ফের আলোয় কমরেড় সরকারের অবিচলিত মুখভাব চোখে পড়ে। এক এক করে প্রত্যেকের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। মহেন্দ্র, কেষ্ট, পান্নু, বিশু, সতীশ পর পর আট জন জানিয়ে দেয় নীরোদের কথাই তাদের কথা।

"সমর্থক হিসাবে থাকব আমরা, কাজ করতে পারব না"—নবীন, সুশীল, মহীতোষ জানায়।

মহেশ আর থাকতে পারে না, "সমর্থক হিসাবে থাকব, মানে কি? চাঁদা দেবে? ওরকম সমর্থক লাখ লাখ আছে আমাদের। কালকে স্কোয়াডে সুশীল তো গিয়েছিল আমার সঙ্গে, দেখে নি কতজন মজুর চাঁদা দিয়েছে।"

চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে ঘরের এক কোণে বসেছিল ব্যাসদেও, রুগ্ন চেহারা,

মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, পাটের আঁশ জড়িয়ে রয়েছে তারই সঙ্গে। হিন্দীর সঙ্গে বাংলা মিশিয়ে ব্যাসদেও বলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আর এক দিক থেকে শোনা যায় কথার একটা টুকরো, "ছাতুখোর।"—সম্ভবত মহেন্দ্রের কণ্ঠস্বর।

"এ হচ্ছে রেলগাড়ী, অনেক লোক তাতে ওঠে, কেউ বা বিনা টিকিটে আর কেউ বা নেমে পড়ে মাঝপথে। তবু গাড়ী চলবে আর আমিও চলবো। ইঞ্জিন ভী চলে গা ঔর হাম্‌ভী চলে গা। জান ছোড়্‌নে শক্‌তা, ঝাণ্ডা ছোড়ে গা নেহি।"—শেষের কথাগুলো বার বার জোর দিয়ে বলে ব্যাসদেও।

মহেশের বিস্ময় এইবার সীমা হারায়। এতক্ষণ পর্যন্ত যা ঘটছিল ওর দশ দিনের অভিজ্ঞতায় তা মোটেও অপ্রত্যাশিত নয়, বরং স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যাসদেও তাকে অবাক করেছে। দশ দিন হল এখানে এসেছে ও। ব্যাসদেওকে চোখে দেখা দূরে থাক, তার নাম পর্যন্ত এ কদিনে একবারও শোনে নি। মলয়দা পর্যন্ত বলে নি ওর কথা। মহেশ অবাক হয়েছে। ভয়ানক অবাক।

মাত্র দশদিন হল মহেশ এসেছে কলকাতা থেকে। শিবু দাস ভীরু লালঝাণ্ডার লোক ভীরু, কান পাতা যায় না এলাকায়। শিবু দাসকে ছাঁটাই করা হয়েছে এরই এক সপ্তাহ আগে। পাঁচশ শ্রমিক দাঁড়িয়েছিল কারখানা গেটে, ছাঁটাই নেতাকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকবার জন্য। শিবু দাস আসে নি। গঙ্গার ওপারে চলে গেছে কাজ ছেড়ে। মজুররা চিনে নিয়েছে শিবু দাসকে। শিবুর জন্য প্রাণ দিতে এগিয়ে এসেছিল যারা তারাই আজ শিবুকে ভীরু বলছে। শিবু দাস, লালঝাণ্ডার নেতা শিবু দাস, ভীরু—কথাটা শুনতে শুন্‌তে অস্থির হয়ে উঠেছে মহেশ।

থাকতে না পেরে মহেশ বলেছিল মলয়কে, "মলয়দা, শিবু দাসকে আমাদের মধ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, মিটিং ডেকে মজুরদের জানিয়ে দিতে হবে তা।"

মলয় ঘাড় নাড়ে। মুখে বলে, "নিশ্চয়ই। তবে কি জানো ভাই, শিবু দাস না থাকলে আমাদের মিটিংএ লোকই হবে না। মজুররা আজ অবশ্য শিবুকে ভীরু বলছে, দুদিন যেতে দাও। ঘটনাটা একটু থিতিয়ে যাক, মজুররা আবার সব ভুলে যাবে। তা ছাড়া শিবু যদি আবার আমাদের সঙ্গে কাজ করে ভবিষ্যতে, তা হলে কি তার সম্বন্ধে মজুরদের এ কথা বলা ঠিক হবে!

আর এখন তো শিবু দাস চলেই গেছে এখান ছেড়ে, কি লাভ ওকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে?" অবাক হয়ে যায় মহেশ। "শিবু দাসকে মজুররা ভীরু বলছে, আন্দোলনের প্রতি শিবু বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, গা বাঁচাতে পালিয়ে গেছে আন্দোলন ছেড়ে, শিবু দাসের ছাঁটাইয়ে কোন প্রতিবাদ হয় নি দেখে মালিক পরদিনই আরও আটজনকে ছাঁটাই করেছে। শিবু দাসের জন্য মজুরের কাছে লালঝাণ্ডার ইজ্জত নষ্ট হচ্ছে, তবু আমরা মজুরদের বলব না তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার কথা। মহেশ ফেটে পড়ে।

আবাব ঘাড় নাড়ে মলয়। "তোমার কথা তো ঠিকই ভাই, দেখি কি কতদূর হয়।"—মলয় উঠে পড়ে।

শিবু দাস অবশ্য বসে থাকবার লোক নয়। ক দিন যেতে না যেতে, অবস্থা একটু ঠাণ্ডা হবার সঙ্গে সঙ্গেই মুড়ির বস্তা মাথায় শিবু ফিরে আসে গঙ্গার এ পাড়ে। নীরোদ, মহেন্দ্র, কেষ্টদের ডেকে বলে, "শুনছি না কি কলকাতার নেতারা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের তো আস্পর্ধা বড়। আর তোরা কি? মানুষ না জানোয়ার? এখনও আছিস লালঝাণ্ডাব সঙ্গে। জানিয়ে দে—তোদের শিবু দাস না থাকলে তোরাও নেই, আর লালঝাণ্ডাও নেই চটকলে।"

মজুরদের মধ্যে গিয়ে শিবু বলে সরাসরি, "খুব যে বলিস শিবু দাস ভীরু; বলি, আচ্ছা তোদের বুকের পাটা। শিবু দাস চাকরির পরোয়া করে না, বুঝলি। আমি কাজে যাই না যাই তোদের কি বলার আছে শুনি? আমি কাজই ছেড়ে দিয়েছি। বুড়ো হলুম যে।"

যারা শোনে তারা মাথা নাড়ে। বলে, "শিবু কাকা, তুমি আমাদের ছেড়ো না। তুমি থাকলে আমরা বুকে বল পাই। আমরা যতক্ষণ আছি, তোমার আবার খাওয়ার ভাবনা কি?"

মহেশ বোঝে, মলয়দাকে দিয়ে কিছু হবে না। শিবুর বিরুদ্ধে মুখ খুলবার সাহস তার নেই। নীরোদ, মহেন্দ্রদের কাছেও কিছু আশা করা বৃথা। নিজেই তাই সাধ্যমত পোষ্টার দিয়ে আর মজুরদের সঙ্গে কথা বলে প্রচার করেছিল শিবু দাসকে লালঝাণ্ডা থেকে বার করে দেবার কথা। নীরোদ তো একদিন প্রায় তাকে শাসিয়ে বলে দিল, "শিবু দাসকে মজুররা ভালবাসে, তার বিরুদ্ধে কথা বললে মজুররা ক্ষেপে যাবে।" তখনও ব্যাপারটা ও বোঝে নি, বুঝল দিন দুয়েক পরে, সন্ধ্যায় বিশুর ঘরে শিবু দাসকে দেখে।

আজ সন্ধ্যার মিটিংএ তাই যা ঘটে গেল তাতে মহেশ একটুও বিস্ময় বোধ করে নি। নীরোদ, মহেন্দ্রদের এ ব্যবহার খুবই সঙ্গত, খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে তার এই দশদিনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। এটা না ঘটলেই যেন পরমাশ্চর্যের কিছু হত। কিন্তু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে মহেশ ব্যাসদেওকে দেখে—কোথায় লুকিয়ে ছিল এ? অজানা সমুদ্রে লাইট হাউসের সন্ধান পেয়েছে মহেশ।

মিটিং থেকে ফিরে এসেই মলয় শয্যা নিলো। পরের দিন সকালেও তাকে তুলতে পারলো না মহেশ। গোমরা মুখে বারবার কেবলই বলে মলয় "কি করলাম আমি ছ বছরে? সব চেষ্টা, সব পরিশ্রম ব্যর্থ হল। কি করে আমি যাব বোম্বাই সম্মেলনে? কেমন করে মুখ দেখাব আমি? এত চেষ্টা, ছ'বছরের এত পরিশ্রম সব ব্যর্থ হল।"

ব্যাসদেও-এর ডেরা খুঁজে মহেশ যখন পরদিন সকালে পৌছাল তার ঘরে, তখন বেশ একটু বেলা হয়ে গেছে। রবিবার। কারখানা বন্ধ। ব্যাসদেও সামনের দালানে গোটা তিনেক খাটিয়া একত্রে টেনে জন দশেককে জুটিয়ে কি যেন পড়ে শোনাচ্ছে। রামায়ণ কিম্বা মহাভারত নয়, সাতশ' পৃষ্ঠা ব্যাপী রুশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনের যে ইতিহাসখানা পড়ছে ব্যাসদেও আর বাকীরা শুনছে সমনোযোগে, তা দেখে মহেশের বিস্ময়ের আর অন্ত থাকে না। কারখানার কোনও মজুরের হাতে এই প্রথম সে দেখল এ বইখানা।

আরও একঘণ্টা চলল পড়াশুনা। তারপর বাকীরা উঠে যায়। মহেশ ব্যাসদেও আর ঝুমন বসে থাকে। ব্যাসদেও পরিচয় করিয়ে দেয় ঝুমনের সঙ্গে, "কাজ করবে এ, লালঝাণ্ডার নীতিতে বিশ্বাস করে। রাজনীতি পড়েছে।'—সাতশ' পাতার মোটা হিন্দী বইটা দেখিয়ে দেয়। তিনজনে অনেকক্ষণ ধরে চলে কাজের আলোচনা। তার পরে গ্রামের দিকে বেরিয়ে পড়ে ওরা। ছুটির দিন, লাইনের লোক গ্রামে গেছে।

চতুর্থ দিনে মিটিং ডাকা হল ছুটির সময়। মাত্র চারজনের অবিশ্রান্ত প্রচারে এত লোক হবে এটা ওদেরও ধারণাতীত ছিল। কারখানার বাঁশী বাজতে না বাজতে সমস্ত মাঠ ভরে উঠল। কে যে বক্তৃতা দেবে সেটাই হয়ে দাঁড়াল সমস্যা। মলয় বোম্বাই চলে গেছে। মহেশকে এখানের কেউ চেনে না। আর আছে ব্যাসদেও, ঝুমন। ব্যাসদেও বক্তৃতা দিতে পারে না,

কথা বেধে যায় তার। তবু তাকেই দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। হিন্দুস্থানীতে শুরু করে ব্যাসদেও, মজুর যারা এসেছে তারা প্রায় সকলেই বাঙ্গালী—ভাল করে বোঝেও না ব্যাসদেও-এর কথা। উস্‌খুস্‌ করে তবু উঠে যেতে পারে না। ব্যাসদেও বলে চলে মালিকের জুলুম, নিত্য নূতন তাঁত বন্ধ, ছাঁটাই, বদলি, হপ্তাবন্দীর কথা। দূরে যারা বসেছিল তারাও উৎকর্ণ হয়ে শুনতে চেষ্টা করে। ব্যাসদেও বলে শিবু দাসদের কথা। লালঝাণ্ডা তাদের দূর করে দিয়েছে,—নিকাল দিয়া। অসম্ভব চাঞ্চল্য পড়ে যায় সভায়। শিবু দাসকে প্রকাশ্যে ভীরু বলে এত বড় হিম্মত কার? কে একজন চিৎকার করে ওঠে, "শিবু দাস তো ভীরু আর তুমি কি বট হে?"

ব্যাসদেও একটু থামে। তারপর আবার শুরু করে, "শিবু দাস শুধু ভীরু নয়, শিবু দাস সর্দার, মজুরদের সঙ্গে দুশমনি করেছে সে, লালঝাণ্ডার ইজ্জত, মজুরদের বিশ্বাস ধূলায় মিশিয়েছে—সে বেইমান।" মৃত্যুর মত নিস্তব্ধতা ভেদ করে ব্যাসদেও-এর কণ্ঠস্বর শোনা যায়, "হাজার হাজার লোকের ভূখা মরার বিরুদ্ধে লড়তে হবে—লালঝাণ্ডা তৈয়ার হ্যায়।"

ব্যাসদেও-এর বক্তৃতা চলবার সময় সাইকেলে পুলিস এসে ঘিরে ফেলে মিটিং। এবার ছিল মহেশের বক্তৃতার কথা। ব্যাসদেও-এর বক্তৃতা শেষ হলে মহেশ উঠে দাঁড়াবার আগেই এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে যায়। একটি বছর কুড়ি বাইশের ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে শুরু করে "ভাইসব!"—ঝুমন কানে কানে বলে দেয় মহেশের, "ভাস্কর, খুব ভাল ছেলে। লাইনে থাকে। বহুৎ জঙ্গী।"

ভাস্করের বক্তৃতার পর ভীড়ের সঙ্গে মিশে লাইন পার হয়ে বস্তির মধ্যে এসে পড়ে মহেশ। অজানা অচেনা পথঘাট, সঙ্গে যারা ছিল তারা কে কোন দিকে চলে গেছে। রাস্তা অন্ধকার এখনও আলো জ্বলে নি। সাইকেলে চড়ে পুলিস এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে এদিকে ওদিকে। হঠাৎ শুনতে পায়, "এদিকে আসুন কমরেড।"—ফিরে তাকিয়ে মহেশ দেখে কেষ্ট।

কোন উত্তর না দিয়ে মহেশ এগুতে থাকে, পাশে পাশে চলে কেষ্ট। কিছুতে সঙ্গ ছাড়ে না দেখে মহেশ বলে শেষে, "তুমি যাও কেষ্ট। তোমার আসার দরকার নেই। কেষ্ট তবু শোনে না, সঙ্গে সঙ্গে চলে মহেশের।

"কি ভাবছ কেষ্ট?" মহেশ অগত্যা প্রশ্ন করে।

"ভাবছি, আমাদের ছাড়াও লালঝাণ্ডার মিটিং হল !" কেষ্ট উত্তর দেয়।

রাত্রেই ভাস্করের সঙ্গে দেখা করে মহেশ। ভাস্কর বলে. "নইলে যে পুলিস ধরত আপনাদের। আপনাদের ধরলে আমরা গোলমাল করতাম খুবই, তবু যদি আপনাদের নিয়ে যেত ? আমাকে তো আর ধরবে না, যদিই বা ধরে দু' চার ডাণ্ডা লাগিয়ে ছেড়ে দেবে। আর যদি রেখেই দেয়, তাতেই বা কি ? আপনারা বাইরে না থাকলে যে ছাঁটাই রোখা যাবে না, তাই তো বলতে উঠেছিলাম।"—একটু লজ্জিতভাবে শেষ করে কথাগুলো।

দিনগুলো এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে। কাজ, কাজ আর কাজ। তিনটি মাত্র মানুষ। ভাস্করকে নিয়ে এখন হয়েছে চার। প্রয়োজনের গতির সঙ্গে তাল রেখে যেন চলতে পারে না ওরা। তবু ঐ চারিটি মানুষকে কেন্দ্র করে সারা এলাকা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তিন মাইলের মধ্যে পঁয়ত্রিশ হাজার শ্রমিকের বাস। এরই মধ্যে ছাঁটাই হয়েছে সাড়ে চার হাজার জন। পাকা কর্মচারী ছিল যাদের তারা হয়েছে বদলি। মাসের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে এক সপ্তাহের কাজ আর মজুরি। প্রত্যেকটা মানুষ ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসছিল। বাসুকি নাগের ফণা বুঝি এতদিনে টলে উঠেছে—ভূমিকম্পের আসন্ন সংকেত।

চারটি মাত্র মানুষ। তবু এদেরই কেন্দ্র করে হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ মানুষের স্বপ্ন দানা বেঁধে উঠছে। এটা বোঝে ব্যাসদেও, বোঝে মহেশ। শনিবার দিন দাঁড়িয়েছিল গেটে লালঝাণ্ডা পেতে, পঁয়তাল্লিশ টাকা সাহায্য উঠে গেল ইউনিয়ন ফাণ্ডে। সন্ধ্যার পর যত জায়গায় যায় স্কোয়াড করে, একজনও কেউ 'না' বলে না। আগুনের গোলার মত ঘুরে বেড়ায় ওরা চারজন—লাইনে, বস্তিতে, গ্রামে।

হরিনাথ ধরে মহেশকে, "আপনি যা বললেন তা তো ঠিক নয়। মালিক মুনাফা করবে তাতে অন্যায়টা কি আছে ? কত টাকা খাটাচ্ছে সে, সে মুনাফা করবে না তো কি ? আমি যখন টাকা ধার দি, আমিও সুদ নি পুরা চার আনা এক মাসে—মালিক তবে মুফত সে টাকা খাটাবে কেন ?"

হরিনাথের চার আনা আর মালিকের দেড় কোটি টাকা মুনাফার পার্থক্য কি দেড় ঘণ্টা ধরে হরিনাথকে বোঝাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে মহেশ। কিন্তু হরিনাথ ধরে বসে আছে ঐ এক কথা, "মুফতসে টাকা খাটাবে

মালিক ? অনেক বেশী টাকা খাটাচ্ছে, অনেক বেশী সুদ তো নেবেই।"

কি আর করে মহেশ, উঠে পড়বে ভাবছে, ব্যাসদেও জুড়ে দেয় নতুন গল্প। কতদিন চাকরি করছে হরিনাথ, দেশে কে এবং কি আছে জানতে চায় এমনি নানান কথা।

সাত বছর কাজে যোগ দিয়েছে হরিনাথ। সেই যুদ্ধের সময়, যেবার আকাল হল; মহাজনের কাছে জমি, জমা, পুকুর সব বন্ধক রাখতে হল হরিনাথের বাবাকে। হরিনাথের বয়স তখন পনর কিম্বা ষোল। চড়া সুদের ধার শোধ দিতে না পারায় মহাজন নিল সব ডিক্রী করে। নিজের জীবন কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠে হরিনাথ। সেই থেকে এসেছে সে মজুর খাটতে, "আমার বাবা মজুর ছিল না, ঘর বাড়ী জমি জমা অনেক ছিল আমাদের। আমার দাদারা লেখা পড়া জানত, বুঝলেন ?"—মহেশের দিকে তাকিয়ে হরিনাথ বলে। "ঐ যে মহাজন অজয় সামন্ত। আমাদেরই সব কিছু কেড়ে নিয়ে তবেই না বড় লোক হয়ে বসেছে।"—উত্তেজনার মাথায় আরও কি বলতে যাচ্ছিল হরিনাথ।

"কেন, অন্যায়টা কি তাতে ?" তাকে থামিয়ে দিয়ে ব্যাসদেও খুব শান্তভাবে বলে; "টাকা ধার দিয়েছে সুদ নেবে না মহাজন ?"

কি একটা বলতে গিয়েই থেমে যায় হরিনাথ। পাথরের মত গুম হয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ। এক মুহূর্তে হরিনাথ আবিষ্কার করে ফেলেছে মুনাফার রহস্য আর নিজের মজুর হয়ে যাবার ইতিহাস।

এমনি করেই ব্যাসদেওদের সংস্পর্শে নিজেদের মজুর সত্ত্বাকে আবিষ্কার করছে পঁয়ত্রিশ হাজার মেহনতী মানুষ। পাশের কারখানা আর অন্য ডিপার্টের মজুরদের সঙ্গে অবস্থার সামান্য তারতম্যের বিচারে নিজেদের ভালমন্দের হিসাব কষা ছেড়ে দিয়ে একই মজুর সত্ত্বা যেন আবিষ্কার করে ফেলছে তারা—আর নিজেদের অনেক বিরোধের মীমাংসা হয়ে যাচ্ছে আপনা থেকেই। সব কিছুই যেন পালটে যাচ্ছে সেই সঙ্গে।

সব কিছু যেন বদলে যাচ্ছে—নিজেদের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারে ওরা। কথা বলতে যে ব্যাসদেও-এর জিভ শুকিয়ে যেত, কথা বেঁধে যেত ঠোঁটে, সে-ই আজকাল আগুনের ফুলকির মত বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছে। ভাস্কর আর ঝুমন নিজেদের প্রমাণ করেছে সংগঠক বলে।

মহেশকে ঠিক নেশার মত পেয়ে বসেছে এখানের জীবন। সকাল আট-টার আগে গিয়ে গেট মিটিং করা, তারপর বারটা পর্যন্ত পোষ্টার লেখা। টিফিনের ঘণ্টায় মজুরদের সঙ্গে বসে আলোচনা চালানো, পুকুরে স্নান সেরে গ্যাংম্যান সুধীরের বাসায় ফিরে তার পনের বছরের ভাই চাঁদুর রান্না খাবার খেয়ে আবার গরমের ভয়ে গঙ্গার ধারে অশ্বত্থতলায় বসে 'প্যারীর পতন' পড়া, ব্যাসদেওকে বোঝাবার জন্য ইংরাজী বই-এর অনুবাদ করা কিম্বা একমনে গৈরিক গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকা। সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে স্কোয়াডে বেরিয়ে অনেক রাতে পোষ্টার মেরে এসে না খেয়ে বা একটা শুকনো পাউরুটি চিবিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার জীবন —নেশার মত গ্রাস করে ফেলেছে তাকে। তারুণ্যের প্রথম ছটা বছর যে কমরেডদের সঙ্গে অস্থিমজ্জায় মিশে গিয়েছিল তাদের সকলকে পিছনে ফেলে আসতে আর পরীক্ষার ঠিক আগে পড়া ছাড়তে হওয়ায় কী তীব্র অনুভূতিতে ভরে গিয়েছিল ওর মন। অথচ কটা দিনই বা গেছে তারপর।

বদলে যাচ্ছে সব কিছু! নিত্য নূতন লোক যোগ দিচ্ছে লাল ঝাণ্ডায়। রামবিজয়, মনিরুদ্দিন, মহাদেব। "নতুন যারা আসছে কমরেড, তাদের রাজনীতি পড়াতে হবে।"—ব্যাসদেও বলে মহেশকে। তারপর নিজেই শুরু করে দেয় ক্লাশ তাদের নিয়ে।

সতীশের বস্তির পাশ দিয়ে একদিন যাচ্ছিল মহেশ আর ভাস্কর। "কমরেড শোনো।" ওরা ফিরে দেখে সতীশ।
"কি ব্যাপার সতীশ?"—মহেশ বলে।

"শোনো কমরেড।" সতীশ আর কিছু বলে না শুধু মহেশের একটা হাত চেপে ধরে কাঁদতে থাকে। মহেশ তো অবাক। সত্যি বলতে কি, এই প্রথম সে জীবনে কোন মজুরকে কাঁদতে দেখে।

"আমায় ছেড়ো না কমরেড।" অনেক পরে চোখ মুছে সতীশ বলে। "বার বছর আগে আমিই প্রথম এখানে লালঝাণ্ডা পুঁতেছিলুম। সবাই আমাকে লালঝাণ্ডার লোক বলে মান্য করত। আজ বুড়ো বয়সে তারা আমায় ঘেন্না করছে। লালঝাণ্ডা আমি ছাড়ব না, আমি বুঝতে পেরেছি, আমাকে কাজে নাও কমরেড।"

হিন্দুস্থানিদের একটা বস্তি। কংগ্রেস ঘাঁটি। দালাল বস্তি বলে চিনি

দিয়েছিল মলয়। তাই কোন দিন যায় নি মহেশ। রাত সাড়ে নটায় তাড়াতাড়ি ফিরবার সময় "শুনিয়ে বাবু" ডাক শুনে হঠাৎ থেমে যেতে হয় মহেশকে। কি আর বলবে, হয়ত বলবে ফের যদি এদিকে আসেন জান নিয়ে ফিরতে হবে না, কিম্বা হয়ত লাগিয়ে দেবে দু চারটে কীল ঘুসি। দালালরা তো আজকাল বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। পরশু দিনও এমনি একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেদিনও অনেক রাতে ফিরবার পথে রাস্তায় তাকে দাঁড় করাল ব্রণে মুখ ভর্তি এক সিল্কের পাঞ্জাবী পরা বাবু, মহেশ যাকে কোনদিন দেখে নি। তবু মহেশকে শাসিয়েই সে বল্ল "ভদ্রলোকের ছেলে. এখানে এসেছেন কি করতে? মজুর ক্ষেপানর আর জায়গা পেলেন না বুঝি, ভালোয় ভালোয় সড়ে পড়ুন এখান থেকে। নইলে বুঝিয়ে দেব মজাটা।" উত্তর যা দেবার মহেশ অবশ্য তাই দিয়েছিল, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারে নি, কে এ লোক আর কি বা এর উদ্দেশ্য। পরে জানতে পেরেছে খোঁজ নিয়ে, তাড়িখানার মালিক ঐ ভদ্রলোক। মজুর ক্ষেপতে শুরু করায় সত্যিই খুব বিপদে পড়েছেন।

প্রৌঢ় হিন্দুস্থানীটি এতক্ষণে মহেশের কাছাকাছি এসে গেছে, "দেশপ্রিয় পার্কমে কংগ্রেস মিটিং কৌন তোড়া?"

মহেশের অনুমান তা হলে মিথ্যে নয়। মহেশ ভাবে, দেশপ্রিয় পার্কে কংগ্রেস নির্বাচনী মিটিং ভাঙার শোধ এরা বোধ হয় এখানেই তুলবে। অনিচ্ছা সত্ত্বে তাই উত্তর দেয়, "জনতা আর কংগ্রেসকে চায় না তাই কংগ্রেসের মিটিং ভেঙে দিয়েছে।"

"জন্‌তা কংগ্রেসকো নেহি মাংতা।" মহেশের বলা হিন্দী কথাটাই বার কয়েক পুনরাবৃত্তি করে প্রৌঢ় মজুরটি। তারপর বলে, "আপ ঠিক বোলা হ্যায় বাবুজী।" কংগ্রেসকে আর দেশের লোক চায় না, কিন্তু কংগ্রেস না থাকলে দেশের গতি কি, হিমালয় ছাড়া কি ভারতবর্ষ বাঁচে, জল ছাড়া মাছ—মহেশের সামনে প্রশ্ন উত্থাপন করে সে।

আলাপ জমে ওঠে দুজনের। খাটিয়ায় বসে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প চলে। ওদেরই অনুরোধে মহেশ থেকে যায় ওদের সঙ্গে, শুধু সে রাতে নয় পরপর আট রাত। বুঝি সবই, কংগ্রেস বিশ্বাস রাখছে না। কিন্তু বিশ্বাস করব কাকে? গান্ধী - কংগ্রেস - নরেশবাবু —গরম দুধে ঠোঁট পুড়ে যাওয়ায় দই দিয়ে ঘোল খাওয়ার চির পুরাতন কাহিনীও শেষ পর্যন্ত শেষ হয়

নিজেদের উদ্যোগী কর্ম প্রেরণায়।

এমনি সব ছোট খাট ঘটনা তবু যেন কি বিরাট সম্ভাবনার সংকেত। বদলে যাচ্ছে, সব কিছু বদলে যাচ্ছে। সেনপুকুর থেকে চিঠি এসেছে আঁকা বাঁকা হাতের লেখায়, তলায় ষাট জনের সই, "আমরা লালঝাণ্ডার কাজ করতে চাই, আমাদের লালঝাণ্ডার সভ্য করিয়া নিবেন। সংগঠন গড়বার জন্য এদিকে লোক পাঠান।" সঙ্গে এসেছে ষাটটি টাকা।

বিড়লা যেমন এ্যাণ্ডরুলকে মদত করে, লিপটনের মালিক যেমন ব্রুকবণ্ডের মালিককে মদত করে, তামাম মজুর যেদিন সে রকম মদত করতে শিখবে, বজবজের মজুর মদত দেবে বাউড়িয়ার মজুরকে ঐ দিন ইনক্লাব পয়দা হয়ে যাবে। হ্যাম কহতা হ্যায় ওহি রোজ ইনক্লাবী পয়দা হো যায় গা। লাইনের পাশ দিয়ে চলতে চলতে ভেসে আশা কথার টুকরোয় কৌতুহল সামলাতে না পেরে মহেশ ঘরে ঢুকে দেখে, পঞ্চান্ন বছরের বৃদ্ধ মুনীরাম রান্না পাকাতে পাকাতে গল্প করছে বাকীদের সঙ্গে।

সবই এমনি ছোট ছোট ঘটনা। শিবু দাস আর এ পারে আসে না। মুড়ি বিক্রী করতেও না, দল পাকাতেও না। দালালরা প্রথম দিকে খুবই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল, মিটিং ভাঙ্গবার জন্য ঢিল ছুঁড়তো দূর থেকে। আজকাল কাছে ঘেঁষে না মুখ নিচু করে কাজে যায়। সবচেয়ে সেরা দালাল বেচু খাড়া তো দেশেই চলে গেল তিন মাসের ছুটিতে। নরেশ ব্যানার্জির মিটিং মজুররা ভেঙ্গে দিয়েছে। চন্দ্ররায় তো মারই খেলো তাদের হাতে, পুলিস এসে মাঝ রাতে গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে গেছে সিরাজকে। সারা বস্তি তন্নতন্ন করে তল্লাশ করেও ধরতে পারে নি ব্যাসদেওকে। আগেই কাজে নেমছল সতীশ, ক্রমে এসেছে কেষ্ট, পান্নু, বিশু। সন্ধ্যার পরে মহেশকে প্রায়ই দেখা যায় ভাটিখানার আর তার চারপাশে। পুলিসের সঙ্গে যোগ রেখে আরও কাঁচা টাকা উপায়ের পাকা বন্দোবস্ত করে নিয়েছে নীরোদ।

সত্যি বদলে যাচ্ছে সব কিছু। ৬ মাস আগের নিস্তেজ অজগরের মত পড়ে থাকা মানুষগুলো যেন ফুঁসে উঠছে। হরতাল। আম হরতাল। কথা ছুটো শ্রমিকদের মুখে মুখে ফেরে। কারখানায় কাজের ফাঁকে ফাঁকে ও ওর হাতে ইস্তাহার গুঁজে দেবার সাথে সাথে হয়ত বলে ওঠে, হরতাল। সন্ধ্যার পরে মাদুর বুনতে বুনতে রেজ্জাক বলে তার আশে পাশে জমে ওঠা

মানুষগুলোকে, "সাঁইত্রিশ সালের থেকে বড় হরতাল হবে এবার।" পাঁচজন, সাতজন, দশজন মজুর জমে উঠলেই কেমন করে কেউ জানে না সাঁইত্রিশ সালের কথা শুরু হয়ে যায়। বার বছরের ভুলে যাওয়া সাঁইত্রিশ সাল আবার জেগে উঠেছে পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষের মনে। বার বছর পরে কুম্ভকর্ণ ঘুম ভেঙে আবার উঠে বসেছে।

বয়স যাদের অল্প তারা অবাক হয়ে শোনে এই গল্প। হঠাৎ একদিন তাদের কয়েকজন কাউকে কিছু না বলে চলে গেল কলকাতায়। বেলেঘাটা, টালিগঞ্জ আর সব কোন কোন জায়গা ঘুরে এসে তারাও জুড়ে দিল নতুন গল্প। কোথায় কোন ফ্যাক্টরী দখল হয়েছে এই সব। তারা শুধু বুড়োদের মুখের গল্প শুনে চুপ থাকতে নারাজ।—সবই ছোট ঘটনা।

এই সব ছোট ঘটনার অর্থ কি, তা জানে ব্যাসদেওরা। এত বিক্ষোভ, এত সম্ভাবনা তাকে ফুলঝুরির মত নিঃশেষে পুড়ে যেতে দেওয়া নয়। সংগঠিত রূপ দিতে হবে। তাই সচেতন সযত্ন প্রয়াস করে চলে আরও ছোট কাজ —'ষ্ট্রাইক কমিটি'। সময় যে এগিয়ে এসেছে।

ভোর না হতে ব্যাসদেও-এর বাসায় উপস্থিত হয়ে মহেশ দেখে কারখানায় সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর সারারাত অসুস্থ নাথুনী সিংএর পাশে রাত জেগে সবে মাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে ব্যাসদেও। ব্যাসদেও-এর ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আজ আর ওকে ডাকতে ইচ্ছা করে না। মহেশ একা বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করে।

"এই যে কমরেড, এসেছো?" ধড় মড়, করে উঠে বসে ব্যাসদেও।

"না, না তুমি ঘুমোও ব্যাসদেও, আমি একা বের হব আজ।" মহেশের কণ্ঠস্বরে ব্যগ্রতা।

"না কমরেড আরও তাড়াতাড়ি এগুতে হবে আমাদের। সময় যে এগিয়ে এসেছে।"

এগিয়ে আসা সময়ের কথা প্রায়ই বলে ব্যাসদেও। সেদিন ওর চিঠি এল দেশ থেকে, স্ত্রীর অসুখ একবার না গেলেই নয়। মহেশ আর বাকীরা বলেছিল ব্যাসদেওকে, "একবার ঘুরে এস ব্যাসদেও, এখন তো বন্দী হপ্তা, অনেকেই চলে গেছে গাঁয়ে ধান বুনতে। কাজ আপাতত অনেক কম, তা ছাড়া অনেকেই তো এখন রয়েছি আমরা। বোম্বাই সম্মেলন সেরে মলয়দার ফিরতেও দেরী নেই। ঘুরে এসো। ছুটি তো তোমার পাওনাই আছে।

দিন দশেকের মধ্যে একটু সুস্থ হলেই চলে এসো বরং।"

চুপ করে থাকে ব্যাসদেও। অসম্ভব গম্ভীর আর অন্যমনস্ক বলে মনে হয় তাকে। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস চেপে অনেকক্ষণ পরে বলে ব্যাসদেও, "কি করে যাই কমরেড, সময় যে এগিয়ে এসেছে।"

সত্যি সময় এগিয়ে এসেছে। অসংখ্য ছোট ছোট ঘটনা। আর তারই মধ্য দিয়ে ভবিষ্যত হেঁটে আসছে পায়ে পায়ে।

ডিপার্টমেণ্টে ডিপার্টমেণ্টে গড়ে উঠছে মজুরদের ফ্যাক্টরী কমিটি। রান্না পাকাতে পাকাতে যে মজুর ইনক্লাবের স্বপ্ন দেখে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে সাথীর হাতে ইস্তাহার গুঁজে দিতে দিতে যে মজুর বলে ওঠে 'হরতাল,' সন্ধ্যায় মাদুর বোনার ফাঁকে যে শ্রমিক স্বপ্ন দেখে নতুন কোনো সাঁইত্রিশ সালের, কলকাতা ঘুরে এসে যে নওজোয়ান পটারী-এ্যালেনবেরী গড়ার কল্পনায় মশগুল হয়ে ওঠে, তাদেরই নিয়ে গড়ে ওঠে ব্যাসদেও-দের ডিপার্টমেণ্টাল ষ্ট্রাইক কমিটি।

গেটের ছাঁটাই লিষ্টে যেদিন লটকে দেওয়া হল রামবিজয়ের নাম, বিস্থবিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের মত ফেটে পরল কারখানার দু'হাজার মেহনতী মানুষ। দুমাস আগের প্রায় অচেনা রামবিজয়ের জন্য সে দিন আবার ভীড় জমে উঠল গেটে। শিবু দাসের জন্যও এত ভীড় জমে নি।

পর পর সাতদিন তারা ঢুকলো ছাঁটাই নেতাকে সঙ্গে নিয়ে। সপ্তাহ শেষে হপ্তার দিন পাঁচটা কারখানার শ্রমিকরা এসে দাঁড়াল রামবিজয়ের কারখানা গেটে। এত কালের ইংরেজ মালিকের কারখানা গত এক সপ্তাহে রামবিজয়ের কারখানা বলে পরিচিত হয়ে গেছে মজুর মহলে।

হপ্তা আদায় করে হরতাল জারি রেখে বিজয়োল্লাসে রামবিজয়কে নিয়ে নিশান উড়িয়ে এগিয়ে আসে মজুররা। সারি দিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে অন্যসব কারখানার মজুররা। আর গেট রোধ করে ওৎ পেতে আছে রাইফেল হাতে দেড়শ পুলিস—রামবিজয়কে তাদের চাই-ই।

লাফ দিয়ে কারখানার গেটের উপরে দাঁড়িয়ে ওঠে ব্যাসদেও। উদ্যত বেয়নেটের দিকে তাকিয়ে হাঁক দেয় মজুরদের "চলো সিধা চলো।"—মৃত্যুর মত নিস্তব্ধতা বিরাজ করে কয়েক সেকেণ্ড। স্লোগানের ঝড়ও থেমে গেছে।

"আইয়ে বাচ্চা লোক। আমি আছি। আমি এগিয়ে যাচ্ছি। আমি থাকতে কেউ মরবে না। আমার পিছন পিছন এসো।—" চীৎকার করে ঝাঁপিয়ে বেরিয়ে আসেন এক মজুর মা।

বাঁধ ভাঙা জলস্রোত পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ে। দূরে, রেললাইনের উপর চোখে পড়ে অস্পষ্ট একটি মানুষ। উস্কো খুস্কো চুল, মুখে বড় বড় গোঁফ দাড়ি উর্ধ্ব শ্বাসে ছুটে আসছে গেটের দিকে। দৌড়াতে দৌড়াতে এসে ভীড়ে মিশে যায়। মলয়দা শিবু দাসকে অতিক্রম করে মিছিলে মিশে গেছে।

প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আমেরিকার প্রগতি সাহিত্যের সমস্যা

যারা নতুন যুদ্ধের প্ররোচনা দিচ্ছে সেই সাম্রাজ্যবাদীদের হটকারী নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ লড়াইয়ে আজ আমেরিকায় বিভিন্ন মত ও বিশ্বাসের লোকেরা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন এবং এঁদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শান্তি ও গণতন্ত্রের এই ক্রমবর্ধমান আন্দোলনে একটা বড় রকমের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন আমেরিকার প্রগতিশীল সাহিত্যিকেরা। সাধারণ মানুষের আমেরিকার নামে, সত্যিকারের আমেরিকার নামে কথা বলার অধিকার আছে কেবল এঁদেরই, এই নির্ভীক ও সৎ শিল্পীদেরই। যে ক্ষয়িষ্ণু সাহিত্য মানুষকে ঘৃণা করতে শেখায়, যে অপদার্থ সাহিত্যে শুধু সমাজবিরোধী অপরাধের বাহাবাধ্বনি শোনা যায়—যা দিয়ে আজ মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলদের পা-চাটা চাকরেরা আমেরিকা ও ইওরোপের বাজার ছেয়ে ফেলছে, তার বিরুদ্ধে আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে দাঁড়িয়েছে আজ এই নতুন সুস্থ সাহিত্য, করছে সে জীবনের জয়ঘোষণা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক জীবনের নামজাদা লোকদের অনেক উক্তি থেকে এবং গত কয় বছরে প্রকাশিত বহু বই ও প্রবন্ধ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, শান্তিকে রক্ষার জন্যে প্রগতিশীল মার্কিন বুদ্ধিজীবীরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

হাডয়ার্ড ফাষ্ট লিখেছেন, অতলান্তিক চুক্তির মত চুক্তির জন্যে আমেরিকার লোকেরা মরতে চায় না। লিখেছেন, বিভিন্ন জাতির ঐক্য ও মৈত্রীই কেবল মানুষকে জীবন, শান্তি ও উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে।

এই প্রতিভাবান লেখক শান্তির লড়াইয়ের একজন অগ্রণী যোদ্ধা। গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন পাঠকেরা তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন; কারণ সরকারী ইতিহাস-লেখকেরা আমেরিকার অতীতকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন, সেই প্রতিক্রিয়াশীল মিথ্যার মুখোশ নির্ভীক হাতে ছিঁড়ে ফেলেছেন ইনি এই উপন্যাসগুলিতে। তার সবচেয়ে ভালো বইগুলিতে ফাষ্ট মার্কিন বুর্জোয়া "গণতন্ত্রের" আসল

সারবস্তুটিকে খুলে দেখিয়েছেন, দেখিয়েছেন তার সূচনা থেকে আরম্ভ করে ('কন্‌সিভড্ ইন লিবার্টি,' 'দি আন্‌ভ্যাঙ্কুয়িস্‌ড্') উনিশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত ('দি লাষ্ট ফ্রন্টিয়ার,' 'ফ্রিডম রোড,' 'দি আমেরিকান')। কিন্তু টম পেইন ও আল্টগেল্ড-এর মত যে-সব চাষীরা লড়াই করে জিতেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা, রক্ষা করেছিল নিজেদের অধিকারকে শোষকদের ক্রমবর্ধমান লোভের কবল থেকে, তারা সবাই আজ দূর অতীতের মানুষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অতীত ইতিহাসকে তার আসল রঙ-এ চিত্রিত করে ফাষ্ট মুখ ফেরালেন বর্তমান আমেরিকার দিকে। লিখলেন 'ক্লার্কটন' নামে উপন্যাস। ১৯৪৫-এর দ্বিতীয় ভাগ এই উপন্যাসের ঘটনাকাল।

শান্তি ও গণতন্ত্রের লড়াইয়ের ঝাণ্ডা আজ উঁচু রেখেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক মতের, বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন বয়সের সুস্থমনা নরনারীরা। এ-আন্দোলনে আমেরিকার কমিউনিষ্টরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

ক্লার্কটনের কারখানাগুলির একটি কারখানার মজুরেরা ফাষ্টের এই শেষোক্ত উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র। এরা প্রগতিশীল ভাবধারায় প্রভাবিত। প্রতিক্রিয়াশীলরা বিভীষিকার রাজ্য সৃষ্টি করে কারখানায়, তার বিরুদ্ধে মেহনতী শ্রেণীর যে-মানুষেরা মাথা তুলে দাঁড়াল তাদের উপর সংঘবদ্ধ আক্রমণ চালাল মানবসমাজের কদর্যতম তলানি যারা উস-কানীদাতা, হরতালভাঙ্গা দালাল, পুঁজিবাদীদের ভাড়াটে গুণ্ডা, ইওরোপে সাবাড় হয়ে আমেরিকায় আবার বেঁচে-ওঠা হিটলারী ঝটিকা বাহিনীর জানোয়ার।

জীবন থেকে বাস্তব ঘটনা সংগ্রহ করে লেখক দেখিয়েছেন যে ইওরোপে পরাজিত ফাশিজম তার শিকড় গেড়েছে আমেরিকায় এবং তার শাসন প্রতিষ্ঠা রত কোনো চেষ্টার ত্রুটি সে করছে না। এই নতুন মার্কিন প্যাটার্নের ফাশিজম তার প্রসারের পথে সব বাধাই গুড়িয়ে দিতে চায়।

ফাষ্ট তাঁর কমিউনিষ্ট ও অন্যান্য প্রগতিশীল চরিত্রগুলির কার্যকলাপের যে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, তা একান্ত বাস্তব, তাতে এতটুকু কল্পনার রঙ নেই। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এঁরা যে-লড়াই চালাচ্ছেন তার পিছনে রয়েছে সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে মার্কিন সমাজের সমস্ত শ্রেষ্ঠ অংশের

সমর্থন, রয়েছে তাঁদের সমর্থন যাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে মজুর শ্রেণীই একমাত্র শক্তি যা ফাশিজম্‌কে সফলভাবে রুখতে পারে। কী পুলিশী অত্যাচার, কী শারীরিক যন্ত্রণা কিছুতেই ফাষ্টের উপন্যাসের নায়কদের মাথা নত করতে পারে না। তারা নির্ভীক, আদর্শের লড়াইয়ে তাদের নৈতিক শক্তির তুলনা মেলে না। যে-সব অসুবিধা ও বিপদের সম্মুখীন তাদের হতে হয় লেখক তা মোটেই গোপন করেননি কিন্তু জন-সাধারণ যে পরিণামে জয়ী হবেই এ বিশ্বাসে তিনি নিঃসংশয় আর এ বিশ্বাস তিনি সংক্রামিত করে দেন তাঁর পাঠকদের মধ্যে।

ফাষ্টের এ-উপন্যাসের উপসংহারেও জীবনের জয়যাত্রার সুর সুস্পষ্ট। তিনি দেখিয়েছেন, সাধারণ মানুষ মেহনতী মানুষ এমন এক সাংঘাতিক শক্তি যার ভয়ে মালিকশ্রেণীর ও তার দালাল পুলিস ও গুণ্ডাদের বুক দুরদুর করে।

শিল্পের সমস্যা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক অবস্থা নিয়ে ফাষ্ট অনেক কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে যে-লড়াই চলছে তাকে আরও উঁচুদরের বাস্তবতা নিয়ে চিত্রিত করার জন্যে তিনি তাঁর লেখক ভাইদের আহ্বান জানিয়েছেন; যে-সব ঘটনা ও চরিত্র নিয়ে তাঁরা বই লিখবেন তাদের চিত্রণে-বিশ্লেষণে তীক্ষ্ণ রাজ-নৈতিক দৃষ্টির পরিচয় দিতে বলেছেন। ফাষ্ট নিজে যা প্রচার করেছেন তার ব্যবহারিক প্রয়োগের চমৎকার দৃষ্টান্ত তাঁর উপন্যাস 'ক্লার্কটন'।

আলবার্ট মালৎস একজন বহুমুখী প্রতিভাবান লেখক। ইনি ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও ছোট গল্পের দক্ষ লেখক। একটি সরল প্লট ও দু'তিনটে চরিত্র নিয়ে ইনি মার্কিন জীবনযাত্রার কদর্যতা ও অমানুষিকতাকে খুলে দেখিয়েছেন। এঁর 'দি আণ্ডার গ্রাউণ্ড ষ্ট্রীম' উপন্যাস ১৯৪০-এ লেখা। তখনই ইনি মার্কিন পুঁজিবাদের বাস্তব রূপকে খুলে ধরেছিলেন। কিন্তু সেইখানেই ইনি থেমে থাকেননি, সাথে সাথে দেখিয়েছিলেন সেই সব লোকদের যারা এই বাস্তবতাকে বদলাবার চেষ্টা করছে, যারা আমেরিকার মোহের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তাঁর 'দি ক্রস এ্যাণ্ড দি এ্যারো' উপন্যাস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। যে সময় আমেরিকায় যে সামান্য কয়খানি ভারী ধরনের ফাশিষ্ট-বিরোধী উপন্যাস লেখা হয়েছিল, এখানি তাদের অন্যতম।

মালৎসের বহু রচনার মধ্যে 'দি আণ্ডার গ্রাউণ্ড ষ্ট্রীম' বিশেষ ভাবে

উল্লেখযোগ্য। পুঁজিবাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমেরিকার সাধারণ মানুষের মনে যে-রাগ ধূমায়িত হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া স্বত্ব-ভোগীরা তাদের 'লোহার গোড়ালী' দিয়ে আমেরিকার বুকে যে ফাশিষ্ট পুলিসী শাসন চাপিয়েছে, তার বিরুদ্ধে যে-ঘৃণার আগুন পরিব্যাপ্ত হচ্ছে মার্কিন জনসাধারণের মনে—উপন্যাসখানি যে তাই নিয়েই লেখা তা তার নাম থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফাশিজমের আসল বিপদের কথা এখানে বলা হয়েছে, দেখানো হয়েছে কোন্ জমি থেকে এর জন্ম।

মালৎসের এই উপন্যাসখানিতে যদিও সমগ্রভাবে আশার সুরই প্রবল, তবু উপন্যাসখানি শেষ হচ্ছে তার প্রধান নায়ক একজন প্রগতিশীল মজুরের মর্মান্তিক মৃত্যুতে। 'কালো বাহিনীর' ফাশিষ্টরা তাকে মেরে ফেলে।

তরুণ লেখক আলেকজাণ্ডার স্যাক্সটন-এর 'দি গ্রেট মিডল্যাণ্ড' প্রগতিশীল মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

ড্যাভ্‌ স্প্যাক্‌ নামে একজন রেলমজুর এর প্রধান নায়ক। ড্যাভের চরিত্র দেখানো হয়েছে তার বিকাশের মধ্য দিয়ে। রাজনৈতিক ঘটনা-বলীর সংঘাতের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে চরিত্রের এই বিকাশকে। পাঠককে দেখানো হয়েছে কী ভাবে গঠিত হচ্ছে তার চেতনা, কী ভাবে ইস্পাতকঠিন হয়ে উঠছে তার সংকল্প। এই প্রগতিশীল মার্কিন মজুর অটল সংকল্পে চেষ্টা করছে তার লক্ষ্যে পৌছতে—যে-লক্ষ্য নিজেই সে বেছে নিয়েছে নিজের জন্যে। কী সে লক্ষ্য? যে বিরাট রেললাইনে সে নিজে কাজ করে তার সমস্ত মজুর-শক্তিকে এক করে তোলাই তার লক্ষ্য।

সরল অথচ নির্ভীক ও আবেগময় মজুরদের গভীর মনস্তাত্ত্বিক চিত্র এঁকেছেন স্যাক্সটন সাফল্যের সঙ্গেই। এই মজুরদের দৈনন্দিন জীবনের ও লড়াইয়ের যে-চিত্র তিনি এঁকেছেন তা থেকে দেখা যায়, রেলমজুরদের কাজের অবস্থা ও সাংসারিক পরিবেশ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান কত নিখুঁত।

তিনি রচনা করেছেন নাটকীয় ঘটনায় ভরা এক মহাকাব্যের কাহিনী, নিজেদের অধিকার রক্ষায় মার্কিন মজুরদের নির্ভীক লড়াইয়ের এক বিরাট পটভূমি। মালৎস্‌, ফাষ্ট, স্যাক্সটন ও অন্যান্য প্রগতিশীল লেখকদের এই বইগুলিই প্রগতিশীল পত্রিকা 'মাসেস এ্যাণ্ড মেইনষ্ট্রীম'-এর

সমালোচকদের মার্কিন সাহিত্যে নতুন সম্ভাবনাময় আবির্ভাবের কথা বলবার অধিকার দিয়েছে।

দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে প্রত্যক্ষ ভাবে যোগদান করে, বাস্তবতার সকল রকম বিকাশ থেকে শিক্ষা লাভ করে, সোভিয়েট সাহিত্যের অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হয়ে আজ বহু প্রগতিশীল মার্কিন লেখক আজকের দিনের আসল বীরকে, জীবন ও সংগ্রামক্ষেত্রের দৃষ্টান্তস্থলকে তাঁদের সমস্ত রচনায় চিত্রিত করার প্রচণ্ড গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন।

তবু এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয় যেখানে কোন একজন প্রতিভাবান লেখক এমন একখানি বই লিখেছেন যাতে পুঁজিবাদের মুখোশ খুলে গেছে নির্মম-ভাবে, কিন্তু যে-বইয়ে সত্যিকারের জঙ্গী বীর নায়কের দেখা পাওয়া যায় না। নর্ম্যান মেলারের 'দি নেকেড এ্যাণ্ড দি ডেড' এই ধরনের উপন্যাস।

মার্কিন পাঠকেরা আজ একটা অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধের হিষ্টিরিয়ার মধ্যে বাস করছেন। তাই যে বই-ই আজ সাম্রাজ্যবাদী লড়াই-এর যন্ত্রটাকে খুলে দেখাবে, যে বই-ই নতুন যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করবে, মার্কিন পাঠকের কাছে সে বইয়েরই মূল্য অপরিসীম।

মেলারের বইয়েই পরিষ্কার দেখানো হয়েছে কি ভাবে ফাশিষ্টদের অনুকরণ করে মার্কিন সমরপন্থীরা মিলিটারী ইউনিফর্ম পরা সাধারণ আমেরিকানদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধ্বংস করছে, ইচ্ছা ক'রে বিকৃত করছে সৈন্যদের মনকে, জাগিয়ে তুলছে তাদের নিকৃষ্টতম প্রবৃত্তিকে।

কামিংস্ নামে একজন জেনারেলের ছবি এঁকেছেন মেলার ন্যায্য রাগের সাথে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রশান্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপে অবতরণকারী কোন সৈন্যদলের সে ছিল কম্যাণ্ডার। উদ্ধত অহংকারী শৃঙ্খলাগর্বী, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মূর্ত প্রতীক এই জেনারেলটি হচ্ছে পেশাদার সৈন্য ও পাকা ব্যবসায়ীর সংমিশ্রণ। যুদ্ধ তার কাছে তাড়াতাড়ি বড়লোক হবার পথ, এবং এ-কথা সে তার অধস্তন কর্মচারীদের কাছে বলতে একটুও দ্বিধা করে না। এতখানি মানুষের প্রতি অবহেলা। সে হিটলারবাদের সচেতন ভক্ত। তার বিশ্বাস, জার্মানরা যা রক্ষা করতে পারেনি সেই নিখুঁত 'ফাশিষ্ট' রাষ্ট্র শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই শাসকশ্রেণী প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

নিজে ও তার অধঃস্তন কর্ম্মচারীদের দ্বারা কামিংস তার সৈন্যদের 'মন গঠন করার কাজে লাগল। ফলে কেউ কেউ হ'ল তার নাৎসী প্রথার পুজারী, অন্যেরা ভেঙে পড়ে নতি স্বীকার করল তার পায়। কেবলমাত্র এই ড্রিল সার্জেণ্ট পন্থাই সার্জেণ্ট ক্রফ্‌টের মত মানুষ তৈরী করতে পারে, তৈরী করতে পারে সাম্রাজ্যবাদীর ভাড়াটে সৈন্যের এই 'আদর্শ রূপ' যা কামিংস পিটিয়ে তৈরী করেছে। জাতিবিদ্বেষ, মনুষ্যত্বকে অপমান, অবাধ ধর্ষণ, অত্যাচার—সাম্রাজ্য-বাদী যুদ্ধের এই সব চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যই যুদ্ধের চক্রান্তকারী উপদলের অস্থি-মজ্জায় মিশে আছে, যে-উপদলের প্রতীক উপন্যাসে বর্ণিত জেনারেল কামিংস।

তার আসল চক্রান্তকে ফাঁস করে দিয়ে মেলার ঠিকই করেছেন। চক্রান্ত আর কিছুই না,—প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধ করার সময় থেকেই সে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চক্রান্ত করছে। কামিংস একথা খোলাখুলিই বলছে। আমেরিকা যে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়াই করবে এ বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কামিংস স্পষ্টই বলে : "যুদ্ধের পর আমাদের পররাষ্ট্রনীতি আগের চেয়ে আরও অনেক বেশী নিলর্জ্জ হবে, কপটতা থাকবে তাতে আরও অনেক কম। আমরা আর বাঁ হাতে চোখ ঢেকে, সাম্রাজ্যবাদী পাত্রের দিকে ডান হাতে এগিয়ে দেব না।" উপন্যাসের শেষে কামিংস বিষণ্ন হয়ে ভাবছে, যে কড়া নীতি সে অনুসরণ করছে তা থেকে হয়ত অভীষ্ট ফল পাওয়া যাবে না, কারণ এই নীতিকে সৈন্যদের নীরব প্রতিরোধের সাথে মোকাবেলা করতে হবে। সে অত্যন্ত চঞ্চল হ'য়ে ওঠে এই ভেবে যে 'রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ যখন বাধবে' তখন হয়ত সে 'খুব একটা কেউকেটা হতে পারবে না, ক্ষমতার গদির কাছাকাছি থাকতে পারবে না'।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ নিয়ে লেখা আর কোনও মার্কিন উপন্যাসেই যুক্ত রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর এতখানি খোলাখুলি সমালোচনা নেই, মার্কিন জনসাধারণের ভবিষ্যত সম্পর্কে এতখানি আন্তরিক উৎকণ্ঠা নেই, যে-ভবিষ্যত আজ জেনারেল কামিংসের মতো ভাগ্যান্বেষী ব্যাবসাদারদের হাতের মুঠোয়। মেলারের উপন্যাসখানির এইটেই শক্ত দিক।

কিন্তু সৈন্য ও অফিসারদের চরিত্র অনেক বেশী দুর্বল। অথচ এদেরই কামিংসের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। বইখানি পড়লে মনে হয় এই তরুণ প্রগতিশীল লেখক ক্ষয়িষ্ণু সাহিত্যের প্রভাবে বেশ কিছুটা প্রভাবিত হয়েছেন। এই ক্ষয়িষ্ণু সাহিত্য মানুষের মনের জোরে বিশ্বাস করে না,

মানুষকে চিত্রিত করে বিকৃত ক'রে, মিথ্যা ক'রে ; মানুষ তার কাছে এক সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ, স্নায়ুদুর্বলতায় পঙ্গু, মৃগীরোগগ্রস্ত জীব। অথচ, এই ক্ষয়িষ্ণু সাহিত্যের দিন বহুদিন হ'ল শেষ হয়ে গেছে।

লেফ্‌টন্যাণ্ট হার্ন ও প্রাইভেট ভ্যালসেন। ভ্যালসেন অসামরিক জীবনে ছিল একজন মজুর। এদের কথা মেলার দরদের সঙ্গে বলেছেন বটে, কিন্তু কামিংস ও ক্রফ্‌টের মত কর্তৃস্থানীয়দের বিরুদ্ধে লড়বার মতো মনের জোর এদের নেই। লড়াইয়ের যন্ত্রের চাপের মুখে তারা দাঁড়াতে পারে না, ভেঙে পড়ে। যা কিছু মানবিক তাদের ভিতর সব কিছু শেষ করে দেয় এই যন্ত্র। হার্ন কামিংসের কাছে নতিস্বীকার করে এবং নিঃশব্দে অপমান হজম করে। ক্রফ্‌টের নির্বোধ, এমন কি শয়তানী আদেশগুলো ভ্যালসেন প্রথমে প্রতিবাদের একটু দুর্বল চেষ্টা করে, পরে মুখ বুজে পালন করে যায়। কম্যাণ্ডারদের সামনে তারা সত্যি 'নগ্ন' ও 'মৃত'। মৃতদেহের মতই তারা প্রতিবাদহীন।

আমেরিকার সংবাদপত্রগুলিতে মেলারের এই উপন্যাসখানার বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রগতিশীল সমালোচকেরা বইখানার শুধু গুণের দিকটাই দেখিয়েছেন, দুর্বলতা সম্পর্কে কোন কথাই বলেননি। এতে এই প্রতিভাবান লেখকের অত্যন্ত অপকার করা হয়েছে। বই-এর দুর্বল দিকটার জন্যেই প্রতিক্রিয়ার শিবির থেকে বাহবার পর বাহবা এসেছে। বই-খানাকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে গত বছরের 'বেষ্ট সেলার' (সবচেয়ে বেশী বিক্রী হওয়া বই) বলে। লেখকের মনে যত সদিচ্ছাই থাক না কেন, বুর্জোয়া সমালোচকেরা বইখানাকে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে লাগিয়েছেন ষোল আনাই, দেখিয়েছেন আমেরিকার যুদ্ধপন্থী উপদলের বহুল প্রচারিত অপরাজেয়তা।

আমরা মনে করি প্রগতিশীল সাহিত্য সমালোচনার সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ সম্পর্কে একটু খুলে বলা উচিত। তাই আমাদের এই পত্রিকার তিন নম্বর সংখ্যায় 'মাইন্‌স্ আমেরিকান্' ব'লে আর, সামারিনের যে-প্রবন্ধ বেরিয়েছিল এখানে আবার তার প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি। এই প্রবন্ধের কিছু কঠোর সমালোচনায় আমাদের কোন কোন আমেরিকান বন্ধু ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ষ্টিফেন ভিনসেণ্ট বেনেটের 'আমেরিকা', বিল মলডিনের 'আপ ফ্রণ্ট' ও জে, হেরেসির বইগুলি সম্পর্কে আমাদের

প্রতিকূল মন্তব্যকে তাঁরা মেনে নিতে পারেননি।

একজন মার্কিন পত্রলেখক আমাদের লিখেছেন যে, ১৯৪৩ সালে বেনেট তাঁর 'আমেরিকা' বইখানা প্রকাশ করেন, তখন তাঁর অভিপ্রায় ছিল খুবই ভালো, উদ্দেশ্যও ছিল মহত্তম। যে সব দেশ তখন মার্কিন সেনাবাহিনী আক্রমণ করেছিল, সেই সব দেশের জন্যই নাকি বইখানি লেখা হয়েছিল এবং লেখক নাকি ইওরোপ ও এশিয়ার জনসাধারণকে দেখাতে চেয়েছিলেন পশ্চিম ইওরোপের ফাশিষ্ট শাসনব্যবস্থা থেকে বুর্জোয়া গণতন্ত্র কত ভাল। কিন্তু, বেনেটের সদভিপ্রায় সত্ত্বেও বইখানা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ 'রাইজ টু ওয়ার্লড পাওয়ার' নামে দ্বাদশ পরিচ্ছেদের কথাই ধরা যাক। লেখক এখানে বলতে চেয়েছেন, কিউবা, ফিলিপাইন ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা প্রগতিশীল (বেনেট আমাদের বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন যে, এই দ্বীপগুলো স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যোগ দিয়েছিল)। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বর্ণনাটা বেনেট এই বলে শেষ করেছেন :

> "এই তো হ'ল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ—এমন এক সাম্রাজ্যবাদ যার পরিণতি হ'ল কিউবা সাধারণতন্ত্রে, ফিলিপাইন্‌স্ কমনওয়েল্‌থে, পোর্টো রিকোর জনসাধারণের পূর্ণ মার্কিনী নাগরিক অধিকার প্রাপ্তিতে, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জকে আলাদা দেশ অথচ আমেরিকার নাগরিক বলে স্বীকৃতিতে। তার নীতি সব সময় নির্ভুল হয়নি, নীতির পিছনে স্বার্থ ছিল না একথা সে বলতে পারে না। কিন্তু এটুকু সে বলতে পারে যে, তার প্রত্যেক নূতন অধিকৃত বা অধীন দেশকে সে দিয়েছে ইস্কুল, আধুনিক চিকিৎসা ও স্বায়ত্তশাসনের শিক্ষা। কোনও জাতিকেই সে একথা বলেনি : 'তুমি যেমন আছ তেমনই থাক। তোমাকে আমাদের দাস হ'য়ে থাকতে হবে।' সে বলেছে : 'নিজেকে শিক্ষিত করে তোল—শেখ কী করে নিজেরা নিজেদের শাসন করতে হয়...।"

বেনেট এখানে শাম্ চাচাকে দেখিয়েছেন এমন এক মাষ্টারমশাইরূপে যিনি কত না দয়া, কত না যত্ন করে অন্য সব জাতকে স্বায়ত্তশাসনের অ, আ, ক, খ, শেখাচ্ছেন, যদিও তারা কেউই তার কাছে উপযাজক হয়ে কিছু শিখতে যায়নি।

এই বই থেকেই একজন মার্কিন লক্ষপতির বর্ণনা তুলে দিচ্ছি :

"পকেট্ ভর্তি টাকা নিয়ে তিনি ইওরোপে এলেন ও জিনিস-পত্র দেখে, সিগার ফুঁকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।...কিনলেন তিনি পর্দা, ছবি, মূর্তি, দুষ্প্রাপ্য বই, পুরো প্রাসাদ অনেকগুলো, ঠক্লেন তিনি অনেকবার, অনেকবার বোকা বন্লেন। কিন্তু শেষে তিনি যা কিনলেন সব এ'ল আমেরিকায়—এবং তার অনেক কিছুই শেষে জনসাধারণের ভোগে ও উপকারে লাগল।"

অতএব, বেনেট আমাদের বিশ্বাস করাতে চান যে, মার্কিন লক্ষপতিরা সংস্কৃতির জন্মদাতা, জনসাধারণের নিঃস্বার্থ হিতকারী। এমতে সায় দেওয়া চরম নিবু'দ্ধিতা। এ ধরনের অনেক উক্তি এ বই-এ আছে। তাই, সোভিয়েট সমালোচক এ বই সম্পর্কে এত কঠোর কথা বলেছিলেন।

অবশ্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সামারিনের প্রবন্ধ 'মাইল্স্ আমেরিকান' আরও ব্যাপক ও আরও বিশদ হ'ত যদি তিনি বেনেটের বইখানার প্রগতিশীল দিকটা দেখাতেন ও বই-এর ভিতরের অন্তর্বিরোধটা খুলে ধরতেন।

সামারিনের প্রবন্ধে মল্ডিনের 'আপ ফ্রন্ট'-এরও কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। বইখানিতে এমন কতকগুলো ব্যঙ্গচিত্রণ ও এমন সব জায়গা আছে যার সুর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। ব্যঙ্গ করা হয়েছে দাম্ভিক, আত্মসন্তুষ্ট মার্কিন আফিসারকে, আর পাশাপাশি দরদ দিয়ে আঁকা হয়েছে সাধারণ সৈন্যকে অর্থাৎ যুদ্ধের মজুরকে। বই-এর এদিকটা সমালোচকের চোখে পড়েনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ ধরনের ব্যঙ্গচিত্র বইখানিতে বেশী নেই; প্রতিক্রিয়াশীল অফিসারদের সমালোচনাও একেবারেই নরম, যেন বন্ধুর মৃদুতিরস্কার, কিন্তু, একথা অস্বীকার করা যায় না মার্কিন সৈন্যের অর্থাৎ আমেরিকার সাধারণ মানুষের যে সাধারণ ছবি তিনি এঁকেছেন তা প্রায় জায়গাতেই অতি স্থূলভাবে প্রকৃতিবাদী হয়েছে। যে মানুষ ফাশিজমের বিরুদ্ধে লড়ছে তাকে যে তিনি এমন বিকৃত ও হীন করে দেখাচ্ছেন, মনে হয় সে বিষয়ে মলডিন খুব বেশী সচেতন ছিলেন না। এবং এই জন্যেই তার প্রতি যথেষ্ট সদিচ্ছা ও সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মার্কিন সৈন্যকে লেখক এমন এক রূপ দিয়েছেন ঠিক যে রূপে মার্কিন যুদ্ধবাদীরা তাকে গড়ে তুলতে চাইছে।

আজগুবি কল্পনা হলেও ধরে নেয়া যাক কোনও সোভিয়েট লেখক ফাশিজমের বিরুদ্ধে লড়াই-এ রত মার্কিন সৈন্যকে এই ভাবেই আঁকলেন। তা' হলে কি হবে? সবাই সোজাসুজি সমস্বরে তাকে নিন্দা করবে। সাধারণ মানুষকে সম্মান দেখানর মনোভাবের মধ্যেই সোভিয়েট মানুষকে গড়ে তোলা হয়েছে।

বিল মলডিন অসাধারণ শক্তিশালী লেখক। তিনি আজ যুক্তরাষ্ট্রের প্রগতিশীলদের সাথে হাত মিলিয়েছেন। বিরোধী শিবিরের যে-প্রভাব তার উপর পড়েছে, এবং যা তার যুদ্ধের সময় লেখা বইগুলিতে প্রতি-ফলিত হয়েছে, তা তিনি কাটিয়ে উঠবেন, এ আশা করবার কারণ আছে।

জন হেরেসি'র বই সম্পর্কে সামারিনের সমালোচনাতেও আপত্তি উঠেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে হেরেসি পরিচিত তাঁর উপন্যাস 'এ বেল ফর আদানো' ও হিরোসিমা সম্পর্কে রিপোর্টের জন্য। দুখানি বইই সোভিয়েট পাঠকের কাছে নিন্দনীয়। কারণ দুখানিতেই অন্য দেশের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের 'উৎকর্ষ' দেখানো হয়েছে। প্রথম বইখানিতে মেজর জোপোলো ও অন্যান্য মার্কিন অফিসারেরা যে উদ্ধত অবহেলার সাথে ইতালীর ছোট একটি শহর আদানোর বাসিন্দাদের সাথে ব্যবহার করেছিলেন ও মার্কিন জীবনযাত্রার অতিরঞ্জিত বর্ণনা দিয়ে যেভাবে তাদের তাক লাগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তা স্মরণ করলেই যথেষ্ট হবে। তাঁর 'হিরোসিমা' এটম বোমার ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার চাঞ্চল্যকর বিবরণ। এ বই বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই নানা ভাষায় এর তর্জমা হয় ও বড় বড় সংস্করণে প্রকাশিত হয়। একথা আজ কে না জানে যে, দুনিয়ার অন্যান্য জাতগুলোকে এটম বোমার ভয় পাইয়ে দেবার জন্যেই মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলের বইটাকে কাজে লাগিয়েছিল।

শুনলাম, জন হেরেসি শান্তি ও গণতন্ত্রের আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। আমরা তাঁর এই নূতন যাত্রাপথের সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করি; আশা করি তাঁর প্রগতিশীল মতবাদ তাঁর ভবিষ্যতের বইগুলিতে অভিব্যক্ত হবে।

আমরা আবার বলি, বেনেট, হেরেসি ও মলডিনের যে-সব বই-এর সমালোচনা সামারিন করেছেন, লেখকদের সদিচ্ছা সত্ত্বেও সেগুলি পাঠকের মনে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগিয়ে তোলে না। কোনও বই-এ যে-দোষই থাকুক না কেন, যত্ন সহকারে, অতিরঞ্জন না করে, অথচ

কোনও প্রকার ক্ষমা না দেখিয়ে, সে দোষ দেখিয়ে দেওয়াই প্রগতিশীল সমালোচনার কাজ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ মার্কিন সমাজের প্রগতিশীল শক্তির হাতে, আর মার্কিন সাহিত্যের ভবিষ্যৎ তার প্রগতিশীল লেখকদের হাতে। তাঁদের রচনার গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে এবং যতই শক্ত করে তাঁরা তাঁদের প্রচেষ্টা মিশিয়ে দিতে পারবেন যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জনগণের সাথে, ততই তাঁদের জনপ্রিয়তা বাড়বে। সামনে এগিয়ে চলা আজ প্রগতি সাহিত্যের পক্ষে শক্ত ব্যাপার। 'মাসেস এ্যণ্ড মেইনষ্ট্রীম' নামে জঙ্গী সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক পত্রিকাখানি এ ব্যাপারে তাঁদের খুব বেশী সাহায্য করবে। কারণ এই পত্রিকাখানিতে আমেরিকার প্রগতিশীল লেখক, সমালোচক ও শিল্পীর সমাবেশ হয়েছে।

সোভিয়েট সংস্কৃতির নতুন নতুন কীর্তির কথা এই পত্রিকাখানি তাদের পাঠকদের নিয়মিত ভাবেই জানিয়ে থাকে এবং অন্যান্য দেশের গণতান্ত্রিক সাহিত্যিকদের রচনা আহ্বান করে। যারা স্থায়ী শান্তি ও সত্যিকারের গণতন্ত্রের জন্যে লড়াই করছে তাদের ঐক্য যে ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠছে এই পত্রিকাখানিই তার প্রমাণ।

মাঝে মাঝে এর পাতায় ভ্রান্ত মত প্রকাশিত হয়, অথবা এমন মত প্রকাশিত হয় যার সত্যতা নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে; মাঝে মাঝে এর পাতায় এমন সব শিল্পীর ছবি বেরোয় আজকের বুর্জোয়া বাস্তবতার বর্জনকে রূপসর্বস্বতার (ফর্মালিজম্) পদ্ধতিতে, অভিব্যক্তিবাদ ও অতি-বাস্তবতাবাদের মনোভাব নিয়ে প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু তবুও এই পত্রিকার সাধারণ ঝোঁক হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিক্রিয়ার মুখোশ খুলে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে প্রগতিশীল শক্তিগুলির সমাবেশ ঘটানো।

পুঁজিবাদী সমাজ ও তার ক্ষয়িষ্ণু আর্টের দূষিত প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে প্রগতিশীল আমেরিকা এমন মহান সাহিত্য রচনা করেছে ও করবে, সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন জনগণের সংগ্রামে যা একটা গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করবে।

এম. রোমানফ

অর্ধ শতাব্দী

(১৯০০—১৯৫০)

আমরা ১৯৫০ সালে পা দিলাম—বিংশ শতাব্দীর মধ্যসীমারেখাও পার হয়ে যাচ্ছি।

এই শতাব্দীর জন্মের সূচনা হয়েছিল ফ্রান্সের প্যারী নগরীতে ১৯০০ সালের বিরাট আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী থেকে। ফ্রান্স ছিল সে সময়কার একটা প্রথম শ্রেণীর পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। দুনিয়ার বাহবা পাবার জন্যে পুঁজিবাদের সাফল্যের জিনিসগুলো ওখানে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। তখন পুঁজিবাদই ছিল একমাত্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা। দুনিয়া জুড়ে চলছিল এরই শাসন। এর কোন প্রতিদ্বন্দ্বীও ছিল না আর কাউকে ভয়ও কোরত না।

একটা বিরাট জমকালো বাজারের মধ্যে একঘেঁয়ে নানা রকমের পণ্যের স্তূপ—এইটুকুই অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়ে প্যারীর প্রদর্শনী সম্বন্ধে। অনেক চেষ্টা করে মনে পড়ছে একটা প্রকাণ্ড ব্যাসওয়ালা নৌ-বাহিনীর কামানের কথা। সেটাকে যন্ত্র বিজ্ঞানের খুব আধুনিক আবিষ্কার মনে করে চার পাশ ঘিরে লোকে দেখছিল। রুশিয়ার বিরাট তাঁবুটা বাইরে থেকে দেখতে লাগছিল ক্রেমলিনের প্রাচীরের মত। তার ওপরে সারাক্ষণই কতকগুলা ঘণ্টার ঐক্যতান শোনা যাচ্ছিল। ভিতরে গেলে নানা রকমের জিনিস কিনতে পাওয়া যেত। সাজান শিল্পদ্রব্যগুলোর মধ্যে পেট মোটা চায়ের কেটলিগুলিই ছিল লক্ষ্য করবার মতো।

সীন নদীর ধারে বিরাট একফালি জমির উপর উপনিবেশ বিভাগটা ছিল সবচেয়ে বড় আর জমকালো। আধুনিক সিনেমা ষ্টুডিওগুলিতে যে ভাবে শহর তৈরি করা হয় ওটাও ঠিক তেমনি দেখাচ্ছিল। আফ্রিকা, এশিয়া, তখনকার অষ্ট্রেলিয়া, আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলো থেকে এখানে প্রতিনিধি রাখা হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শক্তির বল দেখানোর জন্যে বাসিন্দা শুদ্ধ গ্রামগুলোকে প্যারীতে চালান করা হয়েছিল। গ্রামের মানুষরা কম্বল মুড়ি দিয়ে তাদের দেশের চেয়েও ঠাণ্ডা প্যারীতে আকাশের তলায় বসে হি হি করে কাঁপছিল। যৌবন-

হীনা মেয়ে মানুষরা নগ্ন পেটে কোন রকমে অমনোযোগী দর্শকদের সামনে হেলে দুলে রঙ্গ তামাশা দেখাচ্ছিল। এই অস্বাভাবিক এবং বীভৎস দৃশ্যের নাম দেওয়া হয়েছিল "পেটের নাচ"।

অনাহারক্লিষ্ট ঘোড়ায় টানা অমনিবাসে চড়ে গ্যাসের আলোয় আলোকিত পাথর বাঁধানো রাস্তার ওপর দিয়ে খটখট শব্দ তুলে এক এক জন করে যাচ্ছিল। বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা হয়েছিল শুধুমাত্র প্রদর্শনী আর সেণ্ট্রাল বুলভার্দের জন্য।

ইওরোপে তখন শান্তির রাজত্ব—অথবা অনেকের কাছে তাই মনে হতো। শেষ যুদ্ধ হয়ে গেছে তিরিশ বছর আগে আর সে যুদ্ধে তাতে শুধু ফ্রান্স আর প্রুশিয়া এই দুটি দেশ জড়িত ছিল। বর্তমানের দৃষ্টি ভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে লড়াইটা ছিল স্থানীয় এবং ছোট আর তার এলাকা ও স্থায়িত্বও কম। অবশ্য এখানে ওখানে বন্দুকের শব্দ মাঝে মাঝে পাওয়া যেত কিন্তু সেগুলো সরে গিয়েছিল ইওরোপের চোখের বাইরে আর তার প্রতিধ্বনি খুব কমই শোনা যেত। এশিয়ায় চীনাদের, এবং আফ্রিকায় বুয়রদের হত্যা করা হোল। কিন্তু তাতে সম্মানী ইওরোপীয়ানদের কি এসে যায়?

ইওরোপের সর্বত্র "শৃঙ্খলা"। বেশীরভাগ জায়গাতেই রাজতান্ত্রিক শাসন। ফ্রান্স আর সুইজারল্যাণ্ডের দুটি গণতন্ত্র ছাড়া আর সমস্ত ইওরোপীয় রাষ্ট্রে সিংহাসনগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। চারজন সম্রাট এই রাজ্য এবং ডাচেস রাজ্যগুলোর নেতৃত্ব করত। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বৃদ্ধা ভিক্টোরিয়া আর অষ্ট্রো-হাঙ্গারীয়ান সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেছিলেন বৃদ্ধ ফ্রানজ জোসেফ। তাঁরা তাঁদের যুবক আত্মীয় হোহেনজোলার্ন বংশের দ্বিতীয় উইলহেলম আর রোমানভ বংশের দ্বিতীয় নিকোলাসের উপর করুণায় সৌজন্য দেখাতেন। জার, সম্রাট এবং রাজারা পারিবারিক চিঠি পত্র লেখায়, উৎসব উপলক্ষে দেখাশুনায় আর দৌত্যসল। সন্তান উৎপাদনের নীতিতে বিয়ের ব্যবস্থা করতেই ব্যস্ত থাকতেন এবং ইওরোপে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য একজন আর একজনের বিরুদ্ধে বিরামহীন লড়াইয়ে ক্ষান্ত দিতেন না।

এই লড়াই তখন পর্যন্ত কূটনৈতিক স্তরেই আবদ্ধ ছিল—এর নাম দেওয়া হয়েছিল—ইওরোপের ঐক্যতান। প্রধান বাদক ছিল তিনজন

যেটা জার্মানি, অষ্ট্রো-হাঙ্গেরী আর ইতালির যোগাযোগ বলে খ্যাত; আর ছিল ফ্রান্স এবং রুশিয়ার দ্বৈত সঙ্গীত। বৃটেন এই ধরনের সামগ্রিক ব্যাপার পছন্দ করত না। বৃটেন চমৎকার একাকীত্বের বিলাসে সোলো বাজাতো—কিন্তু তার মধ্যে থাকতো একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য যাতে দ্বৈতসঙ্গীতটা তিনজনের ঐক্যতানের বিরুদ্ধে কাজ করে সমস্ত যন্ত্রসঙ্গীতটাকে একটা বিশ্রী ক্যাঁ কোঁ শব্দে পরিণত করে, এবং সেই ফাঁকে পাশে দাঁড়ানো সুচতুর লোকটা বেছে বেছে সেরা জিনিসগুলো তুলে নিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নমেণ্ট কিন্তু জ্ঞানীর মত নিরপেক্ষতার মনোভাব দেখাত। সরকারীভাবে সে এই ঐক্যতান থেকে দূরে সরে থাকত। সরকারী ভাবে তার নীতি ছিল "আমেরিকা আমেরিকানদের জন্য"। বেসরকারী ভাবে ইওরোপও আমেরিকানদের এই নীতি চালাতে চেষ্টা করছিল। পবিত্র বন্ধুত্বের পুরনো ঐতিহ্য অনুসরণ করে ইওরোপের রাজতন্ত্রী পররাষ্ট্র-সচিবরা তাদের গণতন্ত্রী ফরাসী সঙ্গীদের সঙ্গে আমেরিকার এই কম পালিস করা কুটনীতিকে সন্দেহ এবং অপছন্দ করছিল।

একমাত্র এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাড়াটে পুঁজিবাদী খবরের কাগজগুলো "চিরস্থায়ী শান্তির" গান গাইছিল আর সমস্ত ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি করছিল যুদ্ধের জোগাড়। এর জন্য সবচেয়ে দায়ী করা হোত জার্মানির কাইজার উইলহেলমকে, কারণ ভয় দেখান এবং নিজের মনোভাব প্রকাশে সে ছিল সবচেয়ে কড়া বক্তা। তবু যখন চীনের জনসাধারণ ইওরোপীয় এবং আমেরিকান ঘাতকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো, তখন এরা বেশ মিলেমিশেই কাজ করলো। আটটি শক্তি চীনের বক্সার বিদ্রোহকে ধ্বংস করবার জন্য পিটুনী সৈন্য পাঠালো। এই মিলিত বাহিনীর সেনাপতিত্ব করলেন জার্মানির সেনাপতি ফিল্ড-মার্শাল ওয়ালডাসি।

* * * *

শতাব্দীর পরিবর্তনের সময় শান্তির কথাটা হল প্রতারণা—আত্ম-প্রতারণা। পুঁজিবাদের ঘরোয়া ঝগড়ায় দুনিয়া ভরে উঠেছিল। রাজনীতি এবং কূটনীতির দৃশ্যপটের পিছনে বড় বড় অর্থনৈতিক লড়াই চলছিল। পুঁজিবাদের শেষ যুগ এসে পড়লো সাম্রাজ্যবাদে। শান্তিপূর্ণভাবে উপনিবেশ [illegible] নিজেদের তাঁবের জায়গা দখল শেষ হ'য়ে গেল—শান্তিপূর্ণভাবে বাজারের অবস্থাও প্রায় তাই।

রাজনৈতিক ময়দানের উপরের চেয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধান শক্তি সন্নিবেশ করাটা সম্পূর্ণ অন্ত ব্যাপার। এই দ্বন্দ্বে বিস্ফোরণ অবশ্যম্ভাবী।

যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনকে ছাড়িয়ে গেল। ব্রিটানিয়া তখনও "ঢেউকে শাসন করছিল," কিন্তু দেশগুলোর উপর আগের মত শক্ত বাঁধন থাকল না। সুতরাং দ্বিতীয় স্থান পেয়েই তাকে খুশী থাকতে হোল। ইতিমধ্যে জার্মানি ফ্রান্সকে ছাড়িয়ে উঠে তার পায়ের গোড়ায় এগিয়ে আসছিল। এই পরবর্তী উপনিবেশ-মালিকটি যিনি ১৯০০ সালে পুঁজিবাদের জয়যাত্রার সাজ দেখিয়েছিলেন, তিনি এবার চতুর্থ শক্তির স্থানে নেমে এলেন। পা ফস্কে যাচ্ছে দেখে ইনি সাহায্যের আশায় মরিয়া হ'য়ে জারের রুশিয়াকে চেপে ধরলেন। দুনিয়ার এই অর্থনৈতিক দৌড় প্রতিযোগিতায় রুশিয়া অনেক পিছনে পড়ে রইলো। নিজের দেশের মধ্যে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ধাক্কায় স্নায়ুদুর্বলতা এবং অষ্ট্রো-জার্মান পুঁজিবাদের হাঙ্গেরিয়ান সামন্ত-রাজাদের জুলুমবাজী শাসনে অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীর নড়বড়ে রাজত্বও পিছনেই পড়ে রইলো! গোঁ গোঁ শব্দে লোম খাড়া করে বড় বড় শক্তিগুলো পরস্পরের সামনে দাঁড়ালো—যারা উপনিবেশ এবং বাজার দখল করেছিল আর যারা বাঁটোয়ারার বাজারে ফাঁকি পড়েছিল তারা ধ্বংসাত্মক দাবি করে বসলো—"সূর্যের তলায় আমাদেরও জায়গা চাই।" দুনিয়াকে আবার বাঁটোয়ারা করবার জন্য একটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের চক্রান্ত পাকানো হচ্ছিল কূটনৈতিক সঙ্গীত রচনার পিছনে।

এটা যে শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদী লুঠেরাদের মধ্যে সামান্য একটু ঝগড়াঝাটি নয়,—এ যে পুঁজিবাদের অন্তিমকালের ভীষণ সাধারণ সংকট সে-সম্বন্ধে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিজ্ঞ এবং প্রচারকদের কোন ধারণা ছিল না।

বুর্জোয়া দুনিয়া নূতন শতাব্দীকে আত্মসন্তুষ্টি আর আশ্বাসে অভিনন্দন জানালো। পুঁজিবাদ বেড়ে উঠছিল। মনে হোল এটা শুধু স্থায়ীই নয় বোধ হয় চিরস্থায়ী।

অবশ্য একথা সত্য যে, শ্রমিক-সমস্যা কিছু কিছু অস্বস্তির কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। একথাও সত্য যে, ত্রিশ বছর আগে প্যারীর সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুত্থান বুর্জোয়া দুনিয়ার অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় বুর্জোয়ারা ভয় পেয়েছিল। কিন্তু শ্রমিকের রক্তে ডুবিয়ে মারা

হ'লো কমিউনকে। ব্যাঙ্কের মালিকদের পকেটে সোনা ঢেলে পড়েছিল। পুঁজিবাদ নতুন নতুন সাফল্যের উৎসবে ভরপুর। এদের কাগজ সভ্যতা আর পুঁজিবাদকে একাসনে বসিয়ে প্রশংসা কীর্তন করছিল। সভ্যতার জয়যাত্রা, বিজ্ঞান এবং যন্ত্রবিজ্ঞানের অগ্রগতির বিরাট আলোচনা চলছিল। সত্যি ঘটনার সাদা ভাষায় বললে এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, পুঁজিবাদ জনসাধারণের অসতর্কতার সুযোগে দুনিয়ার কোণে কোণে খোলা দরজা দিয়ে নতুন নতুন দেশে ঢুকে পড়ছিল নূতন রাস্তায়: আর যেখানে জনসাধারণ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য উঠে দাঁড়াতো সেখানেই তারা জোরজুলুম করে ঢোকবার জায়গা করে নিত।

নতুন শতাব্দীতে বুর্জোয়া দুনিয়া পুঁজিবাদের অফুরন্ত শক্তি সামর্থ্যের স্তবগানে মুখরিত হয়ে উঠলো। এরা দেখলো না অথবা দেখতে চাইলো না যে একটা ভূত অনেকদিন ধরেই ইওরোপকে ভয় দেখাচ্ছিল—সেটা হ'ল কমিউনিজমের ভূত।

প্যারীর বিরাট প্রদর্শনীর হৈ চৈ, উৎসব, বিরাট কাণ্ড-কারখানা নিয়ে পুঁজিবাদী খবরের কাগজওয়ালারা মেতে রইলো, কিন্তু ঐ ১৯০০ সালেই প্যারী নগরীতে আন্তর্জাতিক সমাজবাদী কংগ্রেসের অধিবেশন প্রায় তাদের নজরেই পড়েনি। তখনকার বিরাট প্রতিপত্তিশালী ফরাসী এবং জার্মান সমাজবাদী দলের প্রতিনিধিরাই সমস্ত সম্মেলনের সমস্ত আলোচনার উপর প্রভাব বিস্তার করছিল। অর্থনীতিবাদ-মার্কা সুবিধাবাদী রুশ সমাজবাদীদের একটা দল উপস্থিত ছিল—অবশ্য এর সঙ্গে প্লেখানভও ছিলেন। ঐ প্রতিনিধিদল কোন স্বতন্ত্র ভূমিকা গ্রহণ করেনি। রুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী তখনও আন্তর্জাতিক শ্রমিক-আন্দোলনে তেমন উল্লেখযোগ্য কিংবা প্রভাবশালী হ'য়ে ওঠেনি।

কংগ্রেসে আলোচনা হ'ল সামরিকবাদ এবং পুঁজিবাদের ঔপনিবেশিক নীতির উপর। সাধারণ ঢালাওভাবে এক একটা ক'রে এবং অন্য সবার উপর তারা সমালোচনা ক'রল, কিন্তু এ সব প্রশ্নের উপর আলোচনার ঝড় ওঠেনি। তর্কের প্রধান বিষয় ছিল এই নিয়ে যে সমাজবাদীরা বুর্জোয়া গভর্নমেণ্টে যোগ দেবে কিনা। উদাহরণ খোঁজার জন্য বেশী দূরে যাবার দরকার কি? ওয়ালডেক রুশোর ফরাসী মন্ত্রী-সভাতেই যোগ দিয়েছিল সমাজবাদী মিলের।

গেদ ঘোষণা করল যে এটা কিছুতেই অনুমোদন করা যায় না; জোরে বলল যে, না তা দেওয়া যায়।" মাত্র এক বছর আগে ১৮৯৯ সালে বার্নষ্টাইন তাঁর "বিবর্তনশীল সমাজবাদ—সমালোচনা এবং বহাল রাখা" নামক শয়তানী পুস্তিকখানা প্রকাশ করেছিল। "বিপ্লবের যুগ শেষ হয়ে গেছে—আব তা ফিরবে না—তার জায়গায় এ যুগে শান্তিপূর্ণ সংস্কার স্থান গ্রহণ করেছে—শ্রমিকরা পার্লামেণ্টারী প্রথায়—বুর্জোয়াদের সঙ্গে সমঝোতা করে সংগ্রাম করবে এবং পুঁজিবাদ কোনরকম যন্ত্রণা সহ্য না করে সমাজবাদে পরিণত হবে" পুস্তিকাটির এই বিশ্বাসঘাতক নীতিকে বুর্জোয়ারা বিরাট অভিনন্দন জানালো। শ্রমিকশ্রেণীর শত্রু মিলের বার্নষ্টাইনের তত্ত্বকে হাতে কলমে কাজে লাগাল বুর্জোয়া মন্ত্রি-সভায় যোগ দিয়ে আর বুর্জোয়াদের সঙ্গে সমঝোতা ক'রে।

প্যারী কংগ্রেসে বার্নষ্টাইনের সমর্থকরা ঘোষণা ক'রল যে, মার্কসবাদের অসাফল্য প্রমাণ হয়ে গেছে এবং এখন একে ঢেলে সাজা দরকার। এটা হ'ল পুঁজিবাদের কাছে চুড়ান্ত আত্মসমর্পণ—শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি চুড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা। এ হ'ল ইওরোপীয় সোশাল-ডেমোক্রাটদের একটা বড় অংশের নৈতিক পতনের লক্ষণ।

প্লেখানভ সমর্থন ক'রলেন গেদকে, কিন্তু গেদও বিপ্লবী দৃঢ়তা এবং অবিচালতার সঙ্গে দাঁড়াননি। কাউটস্কি সমঝোতাবাদীদের দালাল হিসাবে 'রবারের মত স্থিতিস্থাপক একটা প্রস্তাব পেশ করল—যার সার অর্থ হোল—সাধারণ ভাবে মন্ত্রিসভায় যোগদান করা চলবে না কিন্তু বিশেষ অর্থে চলবে। বুর্জোয়া সংস্কারবাদই থেকে গেল। কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেননি যে খুব শিগগিরই সংস্কারবাদ পরাজিত হয়ে যাবে।

তারা যে ঘটনাকে দুনিয়ার ইতিহাসের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মনে করত, তা-ই ছাপতো খবরের কাগজে।

সুতরাং এনার্কিষ্ট ব্রেসকির হাতে ইতালির রাজা আমবার্টের প্রাণনাশ, কোন একটা প্রেমের ব্যাপারে নিজের ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেখার মত ফরাসী প্রেসিডেণ্ট ফেলিক্স ফাউরের হঠাৎ মৃত্যু—তার শূন্য স্থানে এমিল লউবেটের স্থান গ্রহণ, যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাকিনলের সভাপতি হওয়া প্রভৃতি খবরগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে ক'রে পুঁজিপতিদের কাগজে ছাপা

হ'ল। অবশ্য তখনকার দিনে এই সব ঘটনা খানিকটা আগ্রহের ব্যাপার ছিল কিন্তু এখন কোটি কোটি লোক সেগুলো অতি তুচ্ছ মনে করে ভুলে গেছে।

অন্যদিকে যে-সব ঘটনা সত্যি সত্যি ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, দুনিয়ার অগ্রগতির পক্ষে বিরাট প্রভাব বিস্তার ক'রেছিল তা সেই সময়কার কাগজওয়ালাদের নজরে পড়েনি। ১৯০০ সালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা কোন কাগজই লিখে রাখেনি। কোন কাগজই লিখলো না যে, ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন ১৯০০ সালে নির্বাসন থেকে ফিরে এসে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর জন্য একটা খবরের কাগজের সংগঠন গড়ছিলেন—তার চার পাশে গড়ে উঠছিল শ্রমিকশ্রেণীর একটি বিপ্লবী দল আর ঐ ১৯০০ সালেই প্রথম সংখ্যা 'ইস্ক্রা' "স্ফুলিঙ্গ আগুন জ্বালিয়ে দেবে" এই শিরোনামা নিয়ে আত্মপ্রকাশ ক'রল। কোন কাগজেই লিখলো না যে, ঐ ১৯০০ সালেই টিফলিস্ মান-মন্দিরের একজন তরুণ কর্মচারী—জোসেফ ভিসারিওনোভিচ ষ্টালিন—টিফলিসের বাইরেই সোলোনেইতে মে দিবসে শ্রমিকদের এক সভা ক'রেছিলেন।

লেনিনের বলশেভিক স্ফুলিঙ্গ বিপ্লবী আগুন জেলে দিল, আর সে আগুন ছড়িয়ে পড়লো সারা রুশিয়ায়। রুশিয়ার সংস্কারবাদীরা শোচনীয়-ভাবে হার মানলো। এই পরাজয় শুধু রুশিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকলো না। লেনিন এবং ষ্টালিন কর্তৃক সংস্কারবাদী ও সুবিধাবাদী আদর্শের এই মূলোৎপাটন ছিল একটা আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বুর্জোয়া উদারনৈতিকদের পুঁজিবাদের অনাদি স্থায়িত্বের দিবাস্বপ্ন ধূলিসাৎ করে দিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই দেখিয়ে দিয়েছিল যে পুঁজিবাদের অন্তিমকাল উপস্থিত; সমাজবাদী বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী আর এমন একটা পার্টি আছে যে সমাজবাদের সংগ্রামের জন্য সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীকে তালিম দিচ্ছে—সংগঠন ক'রছে।

১৯০৫ সালের বিপ্লব জারশাসনের গোড়া নড়িয়ে দিয়েছিল—যদিও তারপর কিছুদিন তার অস্তিত্ব ছিল। এই বিপ্লবের প্রতিধ্বনি শোনা গেল দুনিয়ার সর্বত্র। রুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর নেতা হ'য়ে দাঁড়ালো। আগেকার চেয়েও গুরুতর অর্থনৈতিক সংকট লেনিনের বিশ্লেষণের সত্যতা প্রমাণ ক'রে দিল। সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ফেটে পড়লো ১৯১৪ সালের যুদ্ধে। ঐ যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফল—অক্টোবর

বিপ্লবের আঘাতে পুঁজিবাদ ব্যবস্থায় ফাটল ধরলো। একটা সমাজবাদী রাষ্ট্রের জন্ম হ'ল আর সেই রাষ্ট্র দ্রুত বেড়ে উঠে হ'ল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী।

প্যারী প্রদর্শনীতে পুঁজিবাদীদের "সাফল্যগুলো" দেখানোর মাত্র সতেরো বছর পরেই দুনিয়ার হালচাল কত বদলে গেছে।

দমকা ঝড়ের ধাক্কায় বেশী পাকা ন্যাসপাতির মত ইওরোপের রাজতন্ত্র আর রাজবংশগুলো ধূলোয় লুটিয়ে পড়ছিল—এবং শুধু ইওরোপে নয়। পুঁজিবাদের শক্তি সমাবেশ আবার নতুন করে সাজানো হ'ল। যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে শুয়ে পড়া জার্মানিকে আবার পায়ে দাঁড় করিয়ে ডলারের চাপে কেঁপে উঠলো রক্ত বাষ্পে ভরা ফাশিজমের বুদ্বুদ।

পুঁজিবাদী দুনিয়ার সামলে নেবার যুগ চলে গেছে। সংকটের ধাক্কায় সমস্ত পুঁজিবাদী দুনিয়া কাঁপছিল। প্রতিক্রিয়াশীল এবং দুঃসাহসবাদীরা ফাশিষ্ট জার্মানিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে নিজেদের বাঁচাতে চেয়েছিল, কারণ সোভিয়েট ইউনিয়নই তাদের ক্লীবত্বের বিরুদ্ধে এবং তাদের বিরুদ্ধে সমস্ত গোলমালের কারণ।

ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের আশা অনুসারে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেল না। সোভিয়েটের মানুষদের জয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে আরও ফাটল ধরিয়ে দিল। লেনিন এবং ষ্টালিনের সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীই ফলে গেল। ষ্টালিন যে ভাবে নক্সা এঁকেছিলেন ঠিক সেই পথ ধরেই ইতিহাস এগিয়েছে—ও পথ তাঁরই সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টির ফলে আঁকা হ'য়েছিল; কারণ মুক্তিকামী মানুষরা তাঁকে নেতা বলে মেনে নিয়েছিল। আজ প্রায় আশি কোটি লোক পুঁজিবাদী শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়েছে আর তারা দাঁড়িয়েছে মার্কস্-এঙ্গেলস্-লেনিন-ষ্টালিনের রক্তপতাকার তলায়।

বিংশ শতাব্দীর উদ্বোধন হ'য়েছিল বুর্জোয়াদের ফাঁকা জয় ঘোষণার মধ্যে। যুগের মাঝখানে পুঁজিবাদের গুরুতর পরাজয় এবং সমাজবাদের জয় হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী অন্তর্দ্বন্দ্বের মুঠোর মধ্যে আছাড়ি পিছাড়ি খেয়ে খেতে ক্রমাগত অসাফল্যে আর বিপর্যয়ে পুঁজিবাদ আর একবার যুদ্ধের মধ্যে নিজের মুক্তির পথ খুঁজছে। গত ৫০ বৎসরের সমস্ত অতীত যুদ্ধে নিহত লোকের চেয়েও বেশী মানুষকে হত্যা করে পুঁজিবাদ জনসাধারণের রক্তের মধ্যে মুক্তি পেতে চাইছে।

দুনিয়ার মানুষ যুদ্ধ চায় না। যুদ্ধবাদীদের পথ আগলে তারা নিরেট প্রাচীরের মত দাঁড়িয়েছে।

> "এমন একটা অবস্থা এসেছে যখন সাম্রাজ্যবাদীরা আর একটা যুদ্ধ শুরু করে জনসাধারণ এবং গণতান্ত্রিক শিবিরের বিরোধিতা ডেকে আনবে আর সেই বিশ্বব্যাপী প্রতিরোধ শুধু মাত্র এক আধটা আক্রমণকারীকেই খতম ক'রবে না, তাতে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে সমস্ত পুঁজিবাদ।"—মলোটভ

তাই হবে। আজকের দিনে অগ্রগতি প্রচণ্ড। একসময় ইতিহাস বেয়াড়া গাড়ীতে চড়ে চাবুক খাওয়া ঘোড়ার টানে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলতো। শতাব্দী শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেটা সামনের দিকে ছুটছে—তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সমাজবাদী বিপ্লবের বাষ্পীয় ইঞ্জিন। আমাদের শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে কমিউনিজমের। আমাদের সমসাময়িক মানুষেরা সত্যিই ভাগ্যবান—তারা এই নূতন প্রভাতকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

নববর্ষ আর নূতন অর্ধশতাব্দী সুখের হোক।

ডি. জাস্লাভ্স্কি

অনশন-বন্দী

কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ অনশন শুরু করেছেন
১লা ফেব্রুয়ারী থেকে ॥
শত শত রাজবন্দীর অনশন-সংগ্রামের প্রেরণায়
শত শত নির্যাতিতা রাজবন্দিনীর রক্তাক্ত প্রতিরোধের চেতনায়
ভারতীয় মজুর-চাষীর মুক্তি-বিপ্লবের প্রবর্তক
ষাট বছরের বৃদ্ধ নেতা অনশন শুরু করেছেন ॥

স্বদেশী জেলখানার নারকীয় অত্যাচারের প্রতিরোধে
বিনা বিচারে সুদীর্ঘ কারাদণ্ডের প্রতিবাদে
সর্বহারা জনগণের প্রিয়তম নেতা অনশন শুরু করেছেন—।
গান্ধি নয় প্যাটেল নয় নেহেরু নয়.
কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ—
সর্বহারা জনগণের বিপ্লবী নায়ক
ষাট বছরের বৃদ্ধ আজ অনশনে :
তাই জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের মাথা জুড়ে
সাড়ম্বরে ছাপা হয় না দেড়ইঞ্চি হরফের খবর।
চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশনের সান্ধ্য টেলিগ্রাফে
মুখর হয়ে ওঠে না এস্‌প্ল্যানেডের গুম্‌টিঘর ;
পুঁজিবাদী শয়তানদের কাগজে ছাপা হয় না
কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের অনশনের কথা ॥

সর্বহারা মজুর-চাষী তাদের বুকের রক্ত দিয়ে পোষ্টার লেখে
রাজপথের মোড়ে মোড়ে
জনকোলাহলমুখর পার্কে পার্কে
অকটারলোনী মনুমেণ্টের তলায় রাগে ফেটে পড়া জমায়েতে
এই অতি-বিস্ফোরক সংবাদ চাপা থাকে না
জঙ্গী মজুর বাহিনীর অগ্নি-নিঃশ্বাসের বেতারে বেতারে
এই ভীষণ সংবাদ সারা পৃথিবীতে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ে।
সমস্ত পৃথিবীর শ্রমিক-সিংহেরা গর্জন করে ওঠে

কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের মুক্তি চাই
বিনা বিচারে বন্দী শত শত কমরেডদের মুক্তি চাই !

ষাট বছরের বৃদ্ধ কাকাবাবু দমদম জেলে অনশন শুরু করেছেন।
যে-সব বন্দী ভাই-বোনেরা
গত দু'মাস থেকে নিরবচ্ছিন্ন অনশন-সংগ্রাম চালাচ্ছেন
অপরাজেয় আত্ম-বিশ্বাসের বিপুল প্রেরণায় ;
ঔপনিবেশিক প্রজাতন্ত্রের লক্ষকোটি সর্বহারার নিত্য-অনশন
চিরকালের জন্য দূর করতে যাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ
শ্রেণী-কলুষিত সংসারে ক্ষুদ্র সুখ ক্ষুদ্র লোভ ক্ষুদ্র মোহের মাথায় লাথি মেরে
যাঁরা আজ আত্মোৎসর্গ করেছেন শ্রমিকনেতৃত্বে পরিচালিত

আন্তর্জাতিক গণ-সংগ্রামে
সেই সব অনশনব্রতী বীর কমরেডদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে
ষাট বছরের বৃদ্ধ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ অনশন শুরু করেছেন।
বাংলার লেনিন আজ জরাজীর্ণ দেহের বৈপ্লবিক মহিমায়
জেলখানার মধ্যে থেকে উর্ধ্বাকাশে তুলে ধরেছেন অনশনের রক্তপতাকা।

এই প্রচণ্ড সংবাদটা যখন কানে এল
মুখ থেকে ভাতের গরাস পড়ে গেল
বন্দী কমরেডদের সুদীর্ঘ অনশনের যে-আগুন
গত দু'মাস থেকে বুকের মধ্যে জ্বলছিল
এই সংবাদ যেন সে-আগুনকে সহস্র শিখায় মারমুখী করে তুললো।
জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখি
আকাশে ধোঁয়া জমেছে মেঘের মতন
মাঝে মাঝে লাল রঙের বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে
অত্যাচারীর মাথায় ঘন ঘন বাজ পড়ছে কখনো দূরে কখনো কাছে
স্বাধীন ভারতের নীল আসমান জুড়ে থম থম করছে বিক্ষোভের ঘূর্ণী ঝড়
মাটির তলায় ভীষণ শব্দ
ভূমিকম্পের দেরী নেই !
কমরেড মুজফ্‌ফর অনশন করেছেন।

১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০

বিমলচন্দ্র ঘোষ

চিঠিপত্র

[সংস্কৃতি সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন সম্পর্কিত চিঠিপত্র আমরা 'পরিচয়ে' আহ্বান করছি—সঃপঃ]

নব পর্যায়ের প্রথম সংখ্যায় গোলাম কুদ্দুস সাহেব গোর্কির 'মা' সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি লিখেছেন আমরা তার প্রশংসা করলেও স্থানে স্থানে একমত হ'তে পারি নি। বিশেষ করে তাঁর একটি বক্তব্যের প্রতিবাদ করা অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচনা করি।

তিনি বলেছেন যে, প্যাভেল ও নিলোভনা 'মা' রচনার সময়ে 'বিরল ছিল,' 'দুর্লভ ছিল', তাদের 'দেখা পাওয়া যেত কদাচিত।' নিলোভনা নাকি 'রুশিয়ার সর্বপ্রথম শ্রমিক-জননী যে সন্তানের সাম্য-বাদী পথে অগ্রসর হয়েছিল।' বিরল, দুর্লভের ছড়াছড়ি করার পরে কুদ্দুস সাহেব বিরল চরিত্রসৃষ্টিকেই সাম্যবাদী বাস্তবতা (তাঁর ভাষায় সোশালিষ্ট রিয়ালিজম) বলে বর্ণনা করেছেন।

এই বক্তব্য সঠিক নয়। বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় কুদ্দুস সাহেবের এই ভুল মারাত্মক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে।

প্রথমত, 'মা' বইয়ের ইংরেজি সংস্করণে যে নোট দেওয়া হয়েছে তার থেকে কয়েকটা লাইন বাংলা করে তুলে দেওয়া যাক।

" 'মা' বইয়ে বর্ণিত ঘটনাগুলি ঘটেছিল নিজ-নি নভোগ্রাদ শহরে, এখানকার সরমোভো জাহাজ কারখানার মজুর ও তাদের সংসার থেকেই গোর্কি তাঁর চরিত্রগুলি বেছে নিয়েছিলেন। মূল চরিত্র প্যাভেল ভ্লাসভকে আঁকা হয়েছে বাস্তব জীবনের প্যাভেল জালোমভের চরিত্র অনুযায়ী। প্যাভেলের মা নিলোভনা একটি মিশ্র চরিত্র। জালোমভের মাও বিপ্লবী মজুর ক্যাডমসেভের মা, এদের মিলিয়ে 'মা' তৈরী হয়েছে। আরও যে সব মজুর মায়েরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের বিপ্লবী কাজে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের জীবন থেকেও নানা ঘটনা নিয়ে নিলোভনার চিত্র সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

"নিলোভনার মতই জালোমভের মা সন্ন্যাসিনী সেজে গ্রামে গ্রামে বিপ্লবী ইস্তাহার ছড়াত। ক্যাডমসেভের মা তার ছেলেকে লুকিয়ে একটা বোমা এনে দিয়েছিল। এই বোমা দিয়ে ক্যাডমসেভ জেল থেকে এক

দুঃসাহসী পলায়নের সময়ে জেলের প্রাচীরের একাংশ উড়িয়ে দিয়েছিল। এজন্য ও আরও নানা কাজের জন্য ক্যাডমসেভের মায়ের দীর্ঘদিনের কারাদণ্ড হয়েছিল। রুশ দেশে সংখ্যাতীত মজুর মায়েরা তাদের ছেলে মেয়েদের বিপ্লবী কাজে অংশ নিয়েছিলেন ও তাদের সঙ্গে জেলে গিয়ে-ছিলেন।.........সরমোভোর মজুরেরা গোর্কিকে তাদের নিতান্ত আপনার জন বলে মনে করে, কারণ গোর্কি তাদের পিতাদের চরিত্রকে জাতির এক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থে অমর করে রেখে গেছেন।"

এর থেকেই বোঝা যাবে যে কুদ্দুস সাহেবের বিরল চরিত্র সৃষ্টির কথাটা অনৈতিহাসিক ও মিথ্যা। গোর্কি তখনকার দিনের সত্যিকারের সংগ্রামী মজুর ও মজুর মায়েদের কাহিনী নিয়েই লিখেছেন, প্যাভেল বা নিলোভনা মোটেই বিরল বা দুর্লভ, বা প্রথম শ্রমিক-জননী ছিলেন না। গোর্কি নিলোভনার চরিত্র আঁকার বহু আগেই অসংখ্য মজুর-মা ছেলেদের বিপ্লবী সংগ্রামে সর্বস্ব পণ করে লড়েছিলেন। সেই সব গৌরবময় বিপ্লবী সংগ্রাম-কাহিনীর এক ক্ষুদ্র কিন্তু প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্য ভগ্নাংশ মাত্র গোর্কি 'মা' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেছেন।

বিরল চরিত্র সৃষ্টি করাকে সাম্যবাদী বাস্তবতা বলে না। বাস্তবে মানুষ যে মহত্ব ও বীরত্ব দেখাচ্ছে সেইগুলিই সাম্যবাদী বাস্তবতার ভিত্তি। মার্কসবাদী, সাম্যবাদী, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত না করলে বাস্তবের সংগ্রামী ও পরিবর্তনশীল রূপটি চিনতে পারা যায় না বলেই এর নাম সাম্যবাদী বাস্তবতা। সংগ্রাম ও পরিবর্তন বাস্তবের মধ্যেই আসে, সেজন্য লেখককে বাস্তবের উপরে ওঠার কথা ওঠেনা।

বাস্তবের উপরে তো উঠতেই হ'বে না, গভীর হয়ে প্রবেশ করতে হবে এই বাস্তব তথ্যের অন্তঃস্থলে, বস্তুবাদী নিষ্ঠার সঙ্গে এই বাস্তবের উপরে নিজেকে দাঁড় করাতে হবে। তবেই দৃষ্টি দিগন্ত প্রসারিত হবে, তবেই বস্তুবাদের শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বিপ্লবী রোমান্টিকতার সাহায্যে বীরত্বপূর্ণ বর্তমানের মধ্য থেকে ভবিষ্যতের মহত্তর সম্ভাবনার পূর্বাভাস ফুটে উঠবে ও সেই ভবিষ্যতের সংগ্রামে সাহায্য করা সম্ভব হবে।

'মার্কসবাদী' ২নং-এ প্রকাশিত সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'বলশেভিক', ত্রয়োদশ সংখ্যা, ১৯৪৮ থেকে নেওয়া

'সোভিয়েট শিল্পকলা বিজ্ঞানের কয়েকটি সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছিল।

তাতে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা (আমি যাকে সাম্যবাদী বাস্তবতা বলেছি) কি বস্তু তা পরিষ্কার করে দেখান হয়েছিল, বিপ্লবী রোমাণ্টিকতার সঙ্গে তার সঠিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখান হয়েছিল। তাতে গোর্কিরই উক্তি তুলে দিয়ে বলা হয়েছিল যে, প্রকৃত অবস্থাকে গভীর ভাবে বুঝতে হবে—'গভীরতরভাবে তার অন্তঃস্থলে প্রবেশ করতে হবে'। বলা হয়েছিল যে 'প্রকৃত ঘটনার সত্য ও ঐতিহাসিক দিক দিয়ে যথাযথ বর্ণনা' দিতে হবে। বলা হয়েছিল যে 'তথ্যনিষ্ঠ' হতে হবে। বলা হয়েছিল যে 'কঠিন বাস্তব কাজ কর্মের' চিত্র দিতে হবে। বলা হয়েছিল যে 'বাস্তব অবস্থাকে "রঙচঙে" করে সাজাবার কোন প্রয়োজন নেই।'

"বি, বালাশ, ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, কারণ, সোভিয়েটের শিল্প-সাহিত্যে 'নায়ককে বেছে নেওয়া হয় আজকের দিনের জনসাধারণের মধ্য থেকে'। এই নায়ক সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অতি পরিচিত টাইপ। আমাদের সঙ্গে তার তফাৎ বিশেষ কিছু নেই।'

"অদ্ভুত অসন্তোষই বটে।......বালাশ সোভিয়েট শিল্পীদের উপদেশ দিচ্ছেন যে, তাঁরা যদি বাস্তব অনুযায়ী 'সাধারণ' নায়ক চরিত্রই ফুটিয়ে তোলেন তবে আমরা নেহাৎ সাদাসিদে একটা ছবি ছাড়া আর কিছুই পাব না।......তিনি শিল্পীদের প্রকৃত ঘটনার বাস্তবপন্থী ছবি তুলে ধরার নীতি ত্যাগ করতে উপদেশ দিচ্ছেন......বাস্তবচেতনা শিল্পসৃষ্টির মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে, আর বিশেষভাবে সোশালিষ্ট বাস্তবচেতনা সম্পর্কে (বালাশ) কিছুই জানেন না। সোভিয়েটের দেশের বাস্তব অবস্থা যে শিল্পের বিষয়-বস্তু হতে পারে এ সম্বন্ধে লেখকের অজ্ঞানতা, সোভিয়েট দেশের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ভুল আলোচনা, সোভিয়েট জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মধ্যে বিষয়বস্তু খুঁজে পাওয়ায় অনিচ্ছা বা অক্ষমতা—লেখকের রিয়ালিজমের প্রতি বিশ্বাসের অভাবের ভিতর এই সবই প্রতিফলিত হয়েছে।"

বালাশ ও তাঁর সহযোগীদের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছিল এত মাস প কুদ্দুস সাহেবকে একই কথা বলতে হয়। সাম্যবাদী বাস্তববোধের শ প্রকৃত ভিত্তির উপরে বিশ্বাস নেই বলেই কুদ্দুস সাহেব 'বিপ্লবী রোমাণ্টিকতা

আশ্রয় নিয়ে দুর্লভ চরিত্র সৃষ্টির কথা তুলে সাম্যবাদী বাস্তবতাটাকেই হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। এই পন্থা নিয়ে লক্ষ প্যাভেল তৈরী করার কাজে সহায়তা করা যায় না, বুর্জোয়া সংস্কৃতির যন্ত্রে পরিণত হতে হয়। কুদ্দুস সাহেব বালাশ ও বিয়ালিকের ভ্রান্ত মত অবলম্বন করেছেন ও তাই চালাবার চেষ্টায় আছেন। 'বলশেভিক' পত্রিকার প্রবন্ধের সুস্পষ্ট সরল তীক্ষ্ণ শিক্ষা তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি।

বাংলা দেশের ও সাহিত্যের মূল ত্রুটি এই যে লেখকরা বাস্তবের গৌরবময় বিপ্লবী ঘটনা ও চরিত্রগুলির দিকে তাকিয়ে দেখছে না। 'বাস্তবে চরিত্র নেই' এই নির্লজ্জ মিথ্যাচারকে ভেঙে খান্ খান্ করে দিয়ে রাস্তায়, কলে, কারখানায়, খেতে-খামারে যে অসংখ্য মহত্ত্ব ও বীরত্বপূর্ণ চরিত্র প্রতিদিন জেগে উঠছে, সেইদিকে লেখকদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে ধরা, সঠিক সাম্যবাদী বাস্তবতার বাস্তববাদী আওয়াজ তোলাই আজ সমালোচকদের কর্তব্য। তা না করে কুদ্দুস সাহেব দুর্লভ চরিত্র সৃষ্টির কথা তুলে ঐ নির্লজ্জ মিথ্যাচারকেই প্রশ্রয় দিলেন ও সাম্যবাদী বাস্তবতাহীন রোমাণ্টিকতার পক্ষে ওকালতি করলেন।

গোর্কি যে পথে এগিয়েছিলেন আমরাও সেই পথে এগোব। সাত বছরের মেয়েকে চেঁচিয়ে বলতে শুনেছি—ওরা আমাদের মারবে কেন, আমি পিছিয়ে যাব না; দশ বছরের ছেলের তপ্তস্বরে হাজার ছাত্র জনতাকে ক্ষেপে উঠতে দেখেছি; দেখেছি গুলিবর্ষণের মধ্যে দাঁড়িয়ে বীর যুবক বোনের মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে রাস্তার লোককে ডাক দিয়ে বলছে—চোখ খুলুক তোমাদের, এগিয়ে এস ভাইসব! শত শহীদের রক্ত জড়ান সংগ্রাম আমরা নিজেদের চোখে দেখেছি, শত মাইল দূরে রক্তে-ভেজা মাটির উপরে বিজয়গর্বে যে নিশান উড়ছে তাকে আমরা চোখ মেলে আকাশে দেখতে পাই।

এই সঠিক প্রতিদিনকার বাস্তবের ভিত্তি নিয়ে রচিত হবে আমাদের সাহিত্য; এই আমাদের দাবি। ধ্রুব আর নির্মল, সুধীর আর চৈতন রামহুনিয়া আর আজিজ, লতিকা আর মাতঙ্গিনী এদের তোমরা চিনতে শেখো। এদের চরিত্র নিয়েই হোক আমাদের সাহিত্য। তোমার কলমের সাধ্য নেই মানুষের বাস্তব মহত্ত্বকে বাড়িয়ে লিখতে পার।

এই বাস্তবকে যদি চিনতে পার, এর চিত্র যদি আঁকতে পার;

তবেই পারবে 'জনগণের মানসিক ভাবসম্পদে রূপান্তর' ঘটাতে, 'তাদের সমাজতন্ত্রের আদর্শে শিক্ষিত করে' তুলতে, 'বীরত্বপূর্ণ বর্তমানের মধ্য থেকে ভবিষ্যতের মহত্তর সম্ভাবনার পূর্বাভাস' ফুটিয়ে তুলতে ও 'সেই ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রামে সাহায্য' করতে।

দুর্লভ চরিত্র সৃষ্টির মত জনসাধারণের প্রতি, যথার্থ বাস্তবের প্রতি আস্থাহীন আওয়াজ বরবাদ হোক। বাংলা সাহিত্যে সাম্যবাদী বাস্তববোধ ও বিপ্লবী রোমান্টিকতার প্রতিষ্ঠা হোক, সাহিত্য সহজবোধ্য গণসাহিত্য হোক।

অনিরুদ্ধ সান্ন্যাল

['পজিটিভ হিরো' সৃষ্টির প্রশ্ন সোশালিষ্ট রিয়ালিজমের একটা অত্যন্ত মূল্যবান অংশ, একটা বিশেষ দিক। কাজেই এই দিকটা সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপন বাংলা সাহিত্যে অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করতে সাহায্য করবে—বিশেষ ক'রে 'লিলিপুট' বা ব্যাঙাচীমার্কা চরিত্র সৃষ্টির অধঃপাতের ধারার বিরুদ্ধে বাংলা সাহিত্যে এ এক নব জীবনের সৃষ্টি করবে।

কিন্তু 'বিরল চরিত্র' সৃষ্টি মাত্রই যদি 'পজিটিভ হিরো' সৃষ্টি হত তাহলে উন্মাদ বা বদ্ধপাগলদের দিয়েও ঐ উদ্দেশ্য সাধন করা যেত। শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম দিকে শ্রেণী সচেতন হয়ে যারা এগিয়ে আসে তাদের সংখ্যা বিরল হলেও তারা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি স্থানীয় তাদের মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শ, শ্রেষ্ঠগুণাগুণ ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য ফোটে। তারা আন্দোলনের ভ্যানগার্ড বা অগ্রগামী, তারা অগ্রগামী সাহিত্যের অগ্রগামী চরিত্র। 'বিরল' হওয়াটাই তাদের গুণ নয়, আন্দোলন যত বাড়তে থাকে তাদের 'বিরলত্ব' তত ক'মে আসে, তাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং ঐতিহাসিক অগ্রগতির ফলে আরও সাধারণ শ্রমিক তাদের পর্যায়ে উঠে আসে। কিন্তু তবু তারা অগ্রগামী বাহিনীই থাকে, সাধারণের মধ্যে মিশে যায় না, কারণ তারা সাধারণ হয়েও অসাধারণ।

অনিরুদ্ধবাবু জালোমভের মা ও ক্যাডমসেভের মা'র উল্লেখ করে বলতে চেয়েছেন প্যাভেলের মা'র মত বহু মা রুশিয়ায় তখন ছিল। 'মা' বইটা ভাল ক'রে পড়লে তিনি দেখতে পেতেন গোর্কি রাইবিনের

মুখ দিয়ে এক জায়গায় বলাচ্ছেন "প্যাভেলের মা-ই বোধ হয় রুশিয়ার প্রথম মা যিনি সন্তানের সাম্যবাদী পথে অগ্রসর হয়েছেন।" কিন্তু প্রশ্নটা আসলে এই নয় যে, প্যাভেলের মা'র মত আরও কয়েকটি মা রাশিয়ায় ছিল, কিম্বা ছিল না কারণ আরও কয়েকটি থাকলেও তারাও শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগামী অংশই ছিল। এরা 'বিরল' হলেও গোর্কি সাহিত্যে ন্যাচারালিজম অগ্রাহ্য করে সেই অগ্রগামীদেরই বেছে নিয়েছিলেন, তাদের মধ্য দিয়েই বাস্তবকে প্রকাশ করেছিলেন। তিনি শুধু আরও কয়েকটি অগ্রগামী "মাকেই" প্রকাশ করেননি, প্রকাশ করেছেন বিপ্লবী আন্দোলনের প্রচণ্ড অগ্রগতিকে।

আমি তাই লিখেছিলাম, **"জীবন্ত বাস্তবের উর্ধ্বে ওঠার প্রয়োজন হয় নি গোর্কির, কারণ গোর্কিকে কল্পনার আকাশে শ্রেণীচেতনার উপাদান খুজতে হয় নি, গোর্কি অগ্রগামী শ্রেণীর অগ্রগামী চরিত্রদের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলেছেন অসাধারণ প্রতিভার আলোকে।"**

রোজেনটালের প্রবন্ধ থেকে ব্যলাশ সম্পর্কে অনিরুদ্ধবাবু উদ্ধৃতি তুলে দেখাতে চেয়েছেন, 'সাধারণ' চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে বাধা দিয়ে আমি নাকী বালাশের দোষে দোষী! কিন্তু তিনি সোভিয়েট যুগের মানুষের বিশেষ ঐতিহাসিক রূপ মনে রাখলে ভাল করতেন। বিপ্লবের সময়েই যদি "এক প্যাভেল লক্ষ প্যাভেলে পরিণত" হয়ে থাকে তা হলে বিপ্লবের বত্রিশ বৎসর পরে তাদের সংখ্যা বহু বহু লক্ষে দাঁড়িয়েছে—কাজেই সেখানে 'সাধারণ' লোক 'অবিরলভাবে' নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তবু সোভিয়েটেও অগ্রগামী মানুষ এবং পার্টির প্রয়োজন সমূহভাবেই আছে—সেই অগ্রগামীদের 'সাধারণের' পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রবলতম আদর্শগত লড়াই চলেছে, কারণ সাধারণদেরই অগ্রগামীর পর্যায়ে তুলতে হবে। সেজন্যই পার্টি মেম্বার, ষ্টাখানোভাইট, 'হিরো' অব দি সোশালিষ্ট লেবার' প্রভৃতির ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে—স্বতঃস্ফুর্ততার স্রোতে তাদের ভূমিকাকে নামিয়ে দেওয়া হয়নি। বিশেষ করে পার্টির অগ্রগামী ভূমিকার কথায় জোর দেওয়া হ'য়ে থাকে। অনিরুদ্ধবাবু রোজেনটালের যে প্রবন্ধের উল্লেখ ক'রেছেন সেটা তিনি আরও একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লে দেখতে পেতেন রোজেনটাল এক জাগায় লিখেছেন ঃ

"কমরেড ফাদায়েভের লেখা 'ইয়ং গার্ড' উপন্যাসটির ত্রুটি বিচ্যুতির আসল ভিত্তি কী ? আমাদের পার্টির সংবাদপত্রে বইটির সমালোচনা করা হয়েছে। সকলেই জানেন যে, উপন্যাসটির মূল ত্রুটি হ'ল এই যে, পিতৃভূমি রক্ষার যুদ্ধের সময় পার্টির ভূমিকা লেখক দেখাননি, **যথার্থ বলশেভিকদের, যারা গোপনে জার্মান বাহিনীর পিছনে সংগ্রামকে দক্ষতার সঙ্গে সংগঠিত করেছেন তাদের উদাহরণ লেখক দেননি।** লেখক এমনভাবে উপন্যাস লিখেছেন যেন যুবক রক্ষীটি (ইয়ং গার্ড) পার্টির নেতৃত্ব ছাড়াই স্বাধীনভাবে কাজ চালিয়ে গিয়েছিল।" (বড়হরফ আমার)

সজ্ঞানেই হোক আর অজ্ঞানেই হোক 'ঘুরিয়েই' হোক আর ফিরিয়েই হোক যাঁরাই অগ্রগামী শ্রেণী, শ্রেণী-সচেতন অগ্রগামী শ্রমিক, 'অগ্রগামী থিয়োরী' এবং অগ্রগামী দলকে তথাকথিত বাস্তবের খাতিরে 'সাধারণের' মধ্যে মিশিয়ে দিতে চাইবে 'পরিচয়' সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রাম চালাবে, তাতে বাংলা সাহিত্যে 'ভুল মারাত্মক বিভ্রান্তির সৃষ্টি' হবে না বরং যে সব বুর্জোয়া ভাবধারা সাহিত্য আলোচনায় কুয়াশা সৃষ্টি করছে তাদের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে সাহায্য করবে।]

গোলাম কুদ্দুস

রবীন্দ্র মজুমদার কর্তৃক নববঙ্গ ভারতী প্রেস, ২৯/৩, ওয়েলিংটন স্ট্রীট হইতে
মুদ্রিত ও ৩০৯, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ হইতে প্রকাশিত।

পরিচয়

গোলাম কুদ্দুস :: সম্পাদক :: সরোজকুমার দত্ত

বিষয়	পৃষ্ঠা
	৯২

নব পর্যায় : তৃতীয় সংখ্যা ফাল্গুন : ১৩৫৬

দাম : আট আনা